শ্রীদুর্গেশনাথ ভট্টাচার্য্য।

ঔষধ বর্জ্জন করুন।

প্রাকৃতিক চিকিৎসা

(পূর্ব্বভাগ।)

বিনা ঔষধে প্রাকৃতিক নিয়মে রোগের চিকিৎসা।

শ্রীদুর্গেশনাথ ভট্টাচার্য্য লিখিত।

মুর্শিদাবাদ।

কণিকা যন্ত্রালয়।

১৩১৭।

পুস্তক পাইবার ঠিকানা।

কার্য্যাধ্যক্ষ, কণিকা প্রেস।

খাগড়া পোঃ আঃ, মুর্শিদাবাদ।

বিজ্ঞাপন।

—:o:—

১৩১৬ সালের প্রথম ভাগে এই পুস্তক প্রেসে দিয়াছিলাম। নিজের ক্লীবত্বের দোষেই হউক, কিম্বা অন্য যে কোন কারণে হউক, এ পর্যন্ত গ্রন্থ সম্পূর্ণ প্রকাশিত করিতে পারিলাম না। গতিকেই গ্রন্থাংশ প্রকাশিত করিলাম। গ্রন্থাংশ প্রকাশিত করিবার দ্বিতীয় কারণ এই যে, নিজের প্রেস থাকাতে দেখিতেছি, আমা অপেক্ষা কত ভাল গ্রন্থকারের গ্রন্থ ঘরে পচিতেছে; সেই জন্য এই অংশের, সম্পাদকেরা কি সমালোচনা করেন এবং অর্থের বিনিময়ে কেহ পুস্তক লন কিনা, তাহা দেখিয়া দ্বিতীয়াংশ প্রকাশিত করিব। তৃতীয় কথা, এই গ্রন্থ যখন লিখিতে বসি, তখন শুধু পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া লিখিতেছিলাম, তারপর যখন দেখিলাম, আমাদের শাস্ত্রেও এ সকল কথা এবং ইহা অপেক্ষা ভাল কথা পাওয়া যায় এবং সে সকল আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত করিয়া দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যায় তখন আর শাস্ত্রত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইতে ইচ্ছা হইল না। অতঃপর এক পার্শ্বে বিজ্ঞান, অপর পার্শ্বে শাস্ত্র, সম্মুখে পাশ্চাত্য চিকিৎসা গ্রন্থ রাখিয়া নূতন গ্রন্থ প্রণয়ন করিবার ইচ্ছা রহিল। আমার ত 'আছে সাধ নাহি সাধ্য,' আমার ইচ্ছায় কি হইবে? এখন সেই ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা হইলেই হইবে। কিমধিকমিতি—

খাগড়া পোঃ,
মুর্শিদাবাদ।
১৩১৭।

শ্রীদুর্গেশ নাথ ভট্টাচার্য্য।

ঔষধ বর্জ্জন করুন।

প্রাকৃতিক চিকিৎসা

(পূর্ব্বভাগ।)

বিনা ঔষধে প্রাকৃতিক নিয়মে রোগের চিকিৎসা।

শ্রীদুর্গেশনাথ ভট্টাচার্য্য লিখিত।

মুর্শিদাবাদ।

কণিকা যন্ত্রালয়।

১৩১৭।

পুস্তক পাইবার ঠিকানা।

কার্য্যাধ্যক্ষ, কণিকা প্রেস।

খাগড়া পোঃ আঃ, মুর্শিদাবাদ।

বিজ্ঞাপন।

—:o:—

১৩১৬ সালের প্রথম ভাগে এই পুস্তক প্রেসে দিয়াছিলাম। নিজের ক্রুটীত্বের দোষেই হউক, কিম্বা অন্য যে কোন কারণে হউক, এ পর্য্যন্ত গ্রন্থ সম্পূর্ণ প্রকাশিত করিতে পারিলাম না। গতিকেই গ্রন্থাংশ প্রকাশিত করিলাম। গ্রন্থাংশ প্রকাশিত করিবার দ্বিতীয় কারণ এই যে, নিজের প্রেস থাকাতে দেখিতেছি, আমা অপেক্ষা কত ভাল গ্রন্থকারের গ্রন্থ ঘরে পচিতেছে; সেই জন্য এই অংশের, সম্পাদকেরা কি সমালোচনা করেন এবং অর্থের বিনিময়ে কেহ পুস্তক লন কিনা, তাহা দেখিয়া দ্বিতীয়াংশ প্রকাশিত করিব। তৃতীয় কথা, এই গ্রন্থ যখন লিখিতে বসি, তখন শুধু পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া লিখিতেছিলাম, তারপর যখন দেখিলাম, আমাদের শাস্ত্রেও এ সকল কথা এবং ইহা অপেক্ষা ভাল কথা পাওয়া যায় এবং সে সকল আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত করিয়া দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যায় তখন আর শাস্ত্রত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইতে ইচ্ছা হইল না। অতঃপর এক পার্শ্বে বিজ্ঞান, অপর পার্শ্বে শাস্ত্র, সম্মুখে পাশ্চাত্য চিকিৎসা গ্রন্থ রাখিয়া নূতন গ্রন্থ প্রণয়ন করিবার ইচ্ছা রহিল। আমার ত 'আছে সাধ নাহি সাধ্য,' আমার ইচ্ছায় কি হইবে? এখন সেই ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা হইলেই হইবে, কিমধিকমিতি—

খাগড়া পোঃ,
মুর্শিদাবাদ।
১৩১৭;

শ্রীদুর্গেশ নাথ ভট্টাচার্য্য।

ভূমিকা।

এই ভূমিকায় লেখকের প্রাকৃতিক চিকিৎসায় ব্যাধি আরোগ্যের বিবরণ ও প্রাকৃতিক চিকিৎসার আবিষ্কর্ত্তাদিগের বিবরণ ও অন্যান্য রোগীর বিবরণ লিখিত হইল। ইহার অনেক স্থলে 'আমি' 'আমার' প্রভৃতি অহমিকায় পূর্ণ, কিন্তু প্রয়োজনীয়তা বোধে, এ অংশ ত্যাগ করিতে পারিলাম না; ইহা পাঠ করিলে পুস্তক ও পুস্তক-লেখককে কতকাংশে বুঝিবার সুযোগ হইবে এবং প্রাকৃতিক চিকিৎসার ব্যক্তিগত বিষয় জ্ঞাত হওয়া যাইবে।

বাঙ্গলা ১৩১১ সালে হৃদরোগে পতিত হই। ঐ সময় শ্বাসরোধ এতই হইত যে, দমবন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইত। জেলার উপরস্থ সাহেব বাঙ্গালী বড় ডাক্তারদিগের দ্বারা ও বড় কবিরাজের দ্বারা চিকিৎসিত হইয়াছিলাম। উহাতে ব্যাধি না কমিয়া ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতে লাগিল, নিতান্ত হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছিলাম, এমন সময়, একজন পাঞ্জাবী বন্ধু Louis Kuhneএর পুস্তকের বিষয় বলেন। বিনা ঔষধে এবং বিনা অস্ত্রে সকল রকম রোগ যে সারিতে পারে, এই প্রথম তাঁহার নিকট শুনিলাম। এ জন্য উক্ত বন্ধুর নিকট চিরঋণী আছি। পুস্তক আনাইয়া পড়িলাম এবং তল্লিখিত প্রক্রিয়া (প্রক্রিয়া গুলিকে প্রয়োগ নাম দিয়া পরিশিষ্টে লিখা হইয়াছে) করিতে আরম্ভ করিলাম। ব্যাধিতে আমাকে এতই জড়িত করিয়াছিল যে এক

খানি 'আরাম কেদারায়' দিন রাত্রি একভাবে বসিয়া থাকিতে হইত; আহার ও শৌচাদি কেদারার নিকটেই সম্পন্ন করিতে হইত; দুই পা হাঁটিয়া চলাফেরা করিতে পারিতাম না। প্রথম প্রক্রিয়া করার ঠিক পরেই ২।৩ রসি হাঁটিতে পারিলাম। জন্মে যে হাঁটিতে পারিব, এটা মনে ধারণা হইত না; আর যদি কখনও হাঁটিতে পারি, তবে ত্রিভুবন হাঁটিয়া ফিরিব, এমন সুখস্বপ্নও মনে উদয় হইত। শুদ্ধ হাঁটিতে পারায় এ চিকিৎসার উপর গাঢ় বিশ্বাস জন্মিল। অতঃপর দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত প্রক্রিয়া সকল সাধন করিতে ও নিয়মমত (উক্ত পুস্তকের লিখিতমত) আহার করিতে লাগিলাম।

ঔষধ নামধেয় অন্ন, মাংস, দুগ্ধ, এই সকল ব্যাধির সময় যথেষ্ট পরিমাণে খাওয়ায়, শরীর পুষ্ট দেখাইত; তারপর প্রক্রিয়া সকল করাতে ও ব্যবস্থিত আহার করাতে, শরীর পাতলা হইতে লাগিল ও শরীরে হাড় দেখা দিতে লাগিল। কিন্তু আমি আন্তরিক স্ফূর্ত্তি অনুভব করিতে লাগিলাম। অপিচ কৃশ চেহারা দেখিয়া বাহিরের লোকে প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিল। কতকদিন এ সকল সহ্য করিয়া স্বকার্য্য সাধন করিলাম। পূর্ব্বে যখন শরীর অবশ হইত, তখন সুরা খাইয়া শরীর গরম করিতাম; খড় পুড়াইয়া তাহারই তাপ পরে শরীর গরমের উপকরণ হইল। শ্বাসরোধ হইয়া প্রাণ যখন 'যায় যায়' হইয়াছে, পূর্ব্বে সেই সময় ঔষধ পান করিতাম; এক্ষণে গড়াইতে গড়াইতে জলের ভিতর পড়িয়া প্রক্রিয়া করিতে লাগিলাম, শ্বাসনালী পরিষ্কার হইয়া যাইত, শরীরে বল আসিত। আর চিকিৎসকের মুখ তাকাইতে হইতনা, স্বজনের শুশ্রূষার অপেক্ষা করিতে

হইত না, ঘ্রাণে স্বাদে উৎকট ঔষধ ব্যবহার করিতে হইত না, জিহ্বাও মুখপ্রিয় পথ্যের স্বাদগ্রহণ হইতে বঞ্চিত হইলেন।

এইরূপে ৪।৫ মাসে মনুষ্যগোত্রে আসিলাম। তারপর 'খাদ্য' ও প্রয়োগ বন্ধ করিলাম, রোগের শেষ যে রাখিতে নাই, তাহা বুঝিয়াও বুঝিলাম না। সেইজন্য পরেও এখন তখন ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছি; বেশী অসুখ হইলে কোন কোন বারে ভয়ে ও স্বজনের তাড়নায় ডাক্তারের সাহায্য লইতে হইয়াছিল। কিন্তু যেমনই রোগের আধিক্য কমিয়া গিয়াছে, অমনিই ঔষধ ত্যাগ করিয়াছি।

আমি আবাল্য পীড়িত। বাটীর নিচে গঙ্গা, কালেকস্মিনে স্নান করিতাম; রৌদ্রে ত বাহির হইতামই না; বাতাস লাগিবে বলিয়া ঘরে আঁটা থাকিতাম। প্রাকৃতিক চিকিৎসা গ্রহণ করার পর রোদ জল বাতাস এই সকল সঙ্গের সঙ্গী হইল। কবিরাজী ঔষধ, এলোপ্যাথিক ঔষধ, হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, টোট্‌কা এই সকল আমার খাদ্যের প্রধান উপকরণ ছিল, এক্ষণে ঔষধ এককালীন বর্জ্জন করিলাম। ডাক্তার কবিরাজ, বাপ-ভাই অপেক্ষা আত্মীয় ছিল, তাঁহারাও শত্রুবৎ হইলেন। দেখিলাম, এরূপ করিয়াও রোগ কমিতে লাগিল, প্রাণ ভরিয়া বিশ্বাস করিয়া চিকিৎসা চালাইতে লাগিলাম। বিরুদ্ধবাদীরা বলিতে লাগিল, পূর্ব্বের ঔষধের re-action হইতেছে, কিন্তু ইহা তাঁহাদের নিজের সময় তাঁহারা কখন বুঝেন না; ঔষধে কিছু হইল না, আবার ঔষধ খাও, এই তাঁহাদের নিয়ম।

আমার আত্ম-চিকিৎসার একজন সমর্থকও মিলিল না। এমন কি, আমার পরিবারের মধ্যে কেহই, আমাকে শীর্ণ দেখিয়া, আমার কার্য্যের

অনুমোদন করিল না। যাহা হউক, লোকের কথায় যত না হউক, নিজের অধ্যবসায়ের ত্রুটীতে চিকিৎসা ত্যাগ করিলাম। কিন্তু যখনই অসুখ অনুভব করিয়াছি, তখনই প্রাকৃতিক চিকিৎসার সাহায্যে ব্যাধি মুক্ত হইয়াছি। ঔষধ-চিকিৎসা ত্যাগের পর, বিদেশে আত্মীয়-আলয়ে একবার সাংঘাতিক পীড়িত হই। একদিন রাত্রে হস্তপদ শীতল হওয়ায়, বাটির ও গ্রামের লোক হলুস্থূল আরম্ভ করিল, আত্মীয় স্ত্রীলোক পরিজনে কাঁদাকাটি ধরিল, আমার জ্ঞান ছিল বলিয়া, ঔষধে বাধা দিতে লাগিলাম। তখন ধূপের গুঁড়া হস্ত পদে তাহারা মালিস করিতে লাগিল। কিন্তু পুনঃপুনঃ তাহাদের নিকট এক গাম্‌লা জল চাহিলাম। রাত্রে জল ঘাটালে, আমার বিকার দাঁড়াইবে, এই ভয়ে তাঁহারা আমার কথায় কর্ণপাত করিলনা, রাত্রি এভাবে অতিক্রান্ত হইল। পরদিন আমার অভিভাবকের নিকট খবর দিতে লোক গেল। আমিও ভাগ্যক্রমে, এক কটাহ জলের সংগ্রহ করিয়া, প্রাণপণে আত্মরক্ষা করিলাম। সে দিন যথেষ্ট জ্বর হইয়া, পরদিন কোষ্ঠ পরিষ্কার ও জ্বর ত্যাগ হইল। আরও ২।৩ বার উৎকট ব্যাধিতে পড়িয়াছি, ঐ রূপেই আত্মরক্ষা করিয়াছি। আমার উৎকট ব্যাধিতে পড়ায়, মঙ্গলময়ের এক মঙ্গল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। যাঁহারা বিনা ঔষধে রোগ সারিতে পারে, বিশ্বাস করিতে পারিতেন না, তাঁহাদের সে বিশ্বাস অপনীত হইতেছে। আমরা ভদ্র সমাজে থাকি, সকল রকম চিকিৎসককে ও শিক্ষিত লোকে আমার এ প্রাকৃতিক চিকিৎসার প্রাদুর্ভাব প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

একজন পূজনীয় বন্ধু ছাপানির অসুখে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মত্যাগ করিয়া সপরিবারে কাশীবাসী হইবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। ক্রমাবয়ে তাঁহাকে

২।৩ বৎসর ছুটি লইতে হইয়াছিল এবং সপরিবারে কয়দিন কাশীবাসও করিয়াছিলেন, তাঁহার কথা কহিবার ও চলিবার ফিরিবার একরূপ ক্ষমতা কমিয়া গিয়াছিল। প্রাকৃতিক চিকিৎসায় আমার উপকার হওয়া দেখিয়া ও আমার নিকট প্রাকৃতিক চিকিৎসার বিষয় অবগত হইয়া, তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ পাঠ করেন ও যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া নিয়মপালন করেন। ইহার ফলে, তিনি আরোগ্য হইয়াছেন এবং চাকুরীতে পুনঃ প্রবিষ্ট হইয়াছেন। ইনি বঙ্গভাষায় এতদ্বিষয়ক একখানি গ্রন্থও প্রণয়ন করিয়াছেন। ইনি মহৎ পিতার সন্তান এবং উচ্চ শিক্ষিত, গ্রন্থ পাঠ ও নিয়ম পালন সম্বন্ধে ইনি যে অধ্যবসায় ও একাগ্রতা দেখাইয়াছেন, তাহা সাধারণে দুর্লভ। একদিন তাঁহাকে যুক্তি দেখাইয়া বস্ত্র ত্যাগ করিবার কথা বলিয়াছিলাম, তিনি আমার কথার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করার পরই বস্ত্রত্যাগ করিলেন, কিন্তু উহা আমার ক্ষমতাতে কুলাইল না। এতদ্ব্যতীত ছোট বড় আরও কয়জন মহাত্মা, আমাদের প্রাকৃতিক চিকিৎসার ঘোরতর পক্ষপাতী ; আর যাঁহারা আমাদের চিকিৎসায় উপকৃত হইয়াছেন, তাঁহারাই পক্ষপাতী।

আমাদের কোন সমিতি নাই ; যাহা আমাদের বিশেষ প্রয়োজনীয় সেই স্নানাগারও এখন প্রতিষ্ঠিত হয় নাই ; পাঠাগার নাই ; বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাগার যে আমাদের জীবনকালে হইবে, তাহারও আশা নাই ; প্রাণিতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য বাহিরে যাইবার সময় নাই ; আমাদের কিছুই নাই, আছে কেবল মন,—বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসেই আমরা হাল ছাড়িতেছি না। ভাবিতেছি 'আজ না হইতে পারে, হ'তে পারে কাল।" প্রাকৃতিক চিকিৎসা গ্রহণের পর যখন বেশী ব্যায়ামে

পড়িয়াছি, তখন ডাক্তারের অধীন হইয়াছি ; কিন্তু এক স্বর্গগত বন্ধুর উপদেশে শিখিয়াছি, On faith our breath, On faith our death. তৎপরে ও বৎসরের মধ্যে অনেক কঠিন ব্যারামে পড়িয়াছি। কিন্তু আর ডাক্তারের কোনরূপ সহায়তা লই নাই। আর যেন জীবনে না লইতে হয় !

জর্ম্মণী, ইংলণ্ড ইত্যাদি স্থানে যে সকল মহাত্মা প্রাকৃতিক চিকিৎসার পিতৃস্থানীয় হইয়া গিয়াছেন ; তাঁহারা প্রায়শঃ সাধারণ ব্যক্তি ; চিকিৎসকও নহেন, বিজ্ঞানবিদও নহেন ; নিজেরা রোগ ভুগিয়া ডাক্তারের দ্বারা যখন কোন ফললাভের সম্ভাবনা নাই বুঝিয়াছেন, তখনই চিন্তা করিয়াছেন আত্ম-নির্ভর দ্বারা কতখানি আত্মরক্ষা করা যাইতে পারে এবং সেই চিন্তা কার্য্যে পরিণত করিয়া বৎসরের পর বৎসর কেবল কার্য্যই করিয়া গিয়াছেন, ইহাতে তাঁহাদের সামাজিক ও আর্থিক ও পারিবারিক ক্ষতির দিকে দৃকপাত করিবার অবসরও ঘটে নাই। এইরূপ এক এক মহাত্মার উদ্যমের ফলস্বরূপ এক এক রকম প্রাকৃতিক চিকিৎসা পদ্ধতি তদ্দেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। আর সে দেশের শত সহস্র লোক নূতনের পক্ষসমর্থণ করিয়া, নব প্রসূত শিশুর ন্যায় সযত্নে লালনপালন করিয়া তদ্দ্বারা সমস্বে স্বকার্য্য সাধন করিয়া লইতেছে। এক একজন আবিষ্কর্তার পুস্তক ৮।১০ বৎসরের মধ্যে ২০।২৫ ভাষায় অনুবাদিত হইয়া প্রত্যেক ভাষার পুস্তকের ৪০।৫০ সংস্করণ পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। এ সকল ভারতবাসীর পক্ষে কল্পনার কথা। ইয়োরোপ ও আমেরিকার তুলনায় 'ভারত শুধু ঘুমায়ে রয় !' ব্যাধি-ক্লীক একবার দেখিয়া আসুন, ঐ সকল দেশে কতগুলি বিনা ঔষধের চিকিৎসালয় চলিতেছে, কত বিদ্যালে

ধনবানে তাহাকে চিকিৎসিত হইতেছে ; আর আপনারা ডাক্তার পূঁজি করিয়া বসিয়া আছেন ! এ দেশে মুসৌরিতে কিম্বা পার্কষ্ট্রীটে যে সকল ঐ প্রথার চিকিৎসাগার আছে, তাহাতে ইয়োরোপিয়েরা চিকিৎসিত হইয়া থাকে মাত্র। প্রাকৃতিক চিকিৎসায় যে সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহা পুস্তকে ও কার্য্যে এমন সামঞ্জস্য দেখাইয়াছে যে, পৃথিবীতে উপস্থিতে আর কোন চিকিৎসা শাস্ত্র, তাহা পারিতেছে না, সুবিচার হইলে, ইহা নিশ্চিন্ত সপ্রমাণ হইবে। তাই স্বদেশবাসীকে বলি, আপনারা একবার প্রাকৃতিক চিকিৎসার পরীক্ষা করুন। আমাদের স্থানাভাব না ঘটিলে, আমরা দেখাইব, আমাদের আদিপুরুষগণ প্রাকৃতিক চিকিৎসারই পক্ষপাতী ছিলেন।

যাঁহার পুস্তক পড়িয়া আরোগ্য লাভ করিয়াছিলাম, সেই লুই কুয়ানকে প্রাণদাতা বলিয়া জানি। পূর্ব্বোল্লিখিত কথাগুলি তাঁহার জীবনী হইতেও সপ্রমাণিত হইতে পারে। কোয়ানের প্রবর্ত্তিত চিকিৎসাপদ্ধতি আবিষ্কার করিতে, তাঁহার ত্রিংশ বৎসর সময় লাগিয়াছিল ; এত কাল ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাকা সাধারণ লোকের কাজ নহে। ঔষধ-বিদ্বেষী হওয়ার তাঁহার দ্বিতীয় কারণ, মাতৃ-আজ্ঞা। তাঁহার পিতার অকালমৃত্যু, তাঁহার মাতা চিররুগ্না, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ও তিনি ঘোর ব্যাধিগ্রস্ত, ঔষধে কাহারও উপকার হইতেছে না, বরং মৃত্যু ও ব্যাধি অগ্রসর হইয়া স্বকার্য্য সাধন করিতেছে ; এই সকল কারণে তাঁহার মাতা উত্যক্ত হইয়া এরূপ আজ্ঞা করিয়াছিলেন। আমরা জানি 'লোকের মুখে জয়, লোকের মুখে ক্ষয়।' লোকের একটা কথাতেই আমরা মত পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলি, কিন্তু অধ্যাপক কুয়ানকে কত গ্লানি, ঠাট্টা বিদ্রূপ সহ্য করিয়া, কত জানি,

কুতর্কের উত্তর প্রত্যুত্তর করিয়া তাঁহার মতে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে হইয়াছিল। এখন লোকে বুঝিয়াছে, তাই সহস্র সহস্র লোকে তাঁহার মতে চিকিৎসিত হইয়া নিরাময় হইতেছে, সহস্র সহস্র পাঠকে তাঁহার গ্রন্থাবলী পঠন করিয়া দেহজ্ঞান লাভ করিতেছে। কুহানের প্রধান আবিষ্কার 'ভাবি-ব্যাধিনিরূপণ, (prognosis) শাস্ত্র'। ভবিষ্যতে যে ব্যাধি হইবে, শরীর দেখিয়া তাহাই পূর্ব্বাহ্নে বলিয়া দিতে, এ শাস্ত্র সক্ষম। অবশ্য শুধু শাস্ত্র পাঠে কিছু নির্ণয় করা যায় না, শাস্ত্র লিখিত বিষয়ের অনুশীলন চাই। শরীরের বাহিরের জাঁক জমকে অনেকে ভুলেন, কিন্তু ভিতরে ভিতরে মৃত্যুকীট যে জাল বুনিতেছে, তাহা অনেকেই টের পান না। সেই মৃত্যুকীটকে এই শাস্ত্র ধরাইয়া দিতে পারে।

অধ্যাপকের মতের সহিত বাহ্যতঃ কোন কোন স্থলে আমাদের মত মিলে নাই। তাঁহার লিখিত বিষয়ে, কোন স্থলে আমরা ফল পাইয়াছি, কোন স্থলে পাই নাই। যে গুলিতে ফল পাইয়াছি, তাহাই লিখিত হইল। ইহার কারণ, স্থান ও পাত্র ভেদে জল বায়ু ও আহারবিহারের রীতিনীতি পৃথক হওয়ায়, এ দেশের অনুরূপ করিয়া কতকগুলি মত পরিবর্ত্তিত করিয়া লওয়া হইয়াছে ও কতকগুলি এককালীন বর্জ্জন করা হইয়াছে। ফল কথা, বাহিরে বিভিন্নতা থাকিলেও, মূল ভিত্তি একই। দ্বিতীয়তঃ, কোন কোন নূতন বিষয় আমাদের মনে উদয় হওয়ায় আমরা পরীক্ষা দ্বারা তাহার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিয়া, তাহা গ্রহণ করিয়াছি। এই সত্যগুলি শাস্ত্র অনুশীলনের ফলে আপনিই বাহির হইয়া পড়ে। ইহাকে আবিষ্ক্রিয়া বলিলে বাক্যাড়ম্বর করা হইবে।

প্রকৃতি পরিচয়।

—————:০:—————

প্রকৃতিজাত কতকগুলি পদার্থের দ্বারা চিকিৎসা কার্য্য সম্পন্ন করা হয়, তজ্জন্য এ চিকিৎসার নাম প্রাকৃতিক চিকিৎসা ; জল, সূর্য্য ও অগ্নির তাপ, মৃত্তিকা ও বায়ু, এই চারিটী প্রাকৃতিক পদার্থই চিকিৎসার মূল উপাদান, তদ্ব্যতীত গাছের পাতা প্রভৃতি আরও কোন কোন প্রাকৃতিক পদার্থের সাহায্য লওয়া হয়। আহার ও দিন যাপন বিষয়ে কতকগুলি নিয়ম প্রাকৃতিক চিকিৎসার অনুকূল করিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে, ঐ সকল নিয়ম আরোগ্য হইবার পক্ষে অতিশয় দরকারী। প্রাকৃতিক শোভাময় দেশে বাস ও ভ্রমণ ইত্যাদি অনেকানেক পন্থা, এ চিকিৎসার অন্তর্ভুক্ত। একটি একটি করিয়া লিখিতে গেলে, চিকিৎসা বিষয়ে অনেক লিখিতে হয়, সময় ও রোগীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া কি করা কর্ত্তব্য, কি অকর্ত্তব্য, নিশ্চিত করা যাইতে পারে। এক্ষণে মোটা মোটি রকমে বিবরণ লিখিত হইল, তাহাতেই পাঠকের সাধারণ জ্ঞান হইতে পারে।

প্রকৃতিকে আমরা চিনি না, কিন্তু আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ তাঁহারই উপাসক ছিলেন। ধন জন অপেক্ষাও প্রকৃতি তাঁহাদের স্পৃহনীয় ছিল, পর্ব্বত কাননে থাকিয়া, প্রকৃতির সহবাসে তাঁহারা ইহ পরকালে যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত কতকগুলি তীর্থ স্থান থাকাতে, এক্ষণেও আমরা প্রকারান্তরে প্রকৃতি সমাগম করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতেছি। প্রকৃতি জননী স্বরূপিণী। আমরা আহার বিহারের

অত্যাচার করিয়া যে জীবনীশক্তি ক্ষয় করিতেছি ও রোগাক্রান্ত হইতেছি, তাহা তিনি তাঁহার স্তন্য পান করাইয়া শোধরাইয়া লইতে পারেন। প্রকৃতি ব্যতীত মনুষ্যে শুধু ঔষধের দ্বারা তাহা পারে না। অনেকে বলেন, ঔষধে প্রকৃতিকে সাহায্য করে। ইহা তাঁহাদের বৃথা অহঙ্কার! যিনি সর্বৈশ্বর্য্যময়ী, তাঁহাকে মানুষে কি সাহায্য করিতে পারে! আজকাল সভ্যতার আলোক জগতের উপর যেরূপভাবে পড়িয়াছে, তাহাতে মনুষ্য প্রকৃতি হইতে কেবলই সরিয়া পড়িতেছে, কুইনাইনে জ্বর বন্ধ করিতে পারিলে, একটা উপবাস দিতে চাহে না, এমন কি, কাঁটা চামচায় ভাত খাইতে পাইলে, হাতে আর খাইতে চাহিবে না। একটি প্রাকৃতিক নিয়ম পালন করিলে, যখন তাহার ফল মঙ্গলজনক হইতে দেখা যায়, তখন ইহা নিশ্চয়ই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, শুধু প্রাকৃতিক নিয়মে চলিলে জগত আনন্দের আগার হইত, রোগ শোক থাকিত না। এক্ষণে প্রকৃতি হইতে আমরা এতই দূরে আসিয়াছি যে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার নিকটস্থ হইবার ক্ষমতা, আর আমাদের নাই, তবুও, চেষ্টা করিয়া আমাদের, এক্ষণে সেই প্রাকৃতিক পথ ধরাই উচিত, অবশ্য ইহাতে যথেষ্ট সময় ও অধ্যবসায় ব্যয়িত হইবে। প্রকৃতি যে কে, কিম্বা কি, তাহা আমাদের বুঝাইবার সম্যক ক্ষমতা নাই; পণ্ডিতকেই বুঝাইতে যাওয়া ধৃষ্টতা। যতখানি বুঝিয়াছি, তাহাই বুঝাইলাম, তারপর পাঠক চিন্তা করিয়া বুঝিয়া লউন। আপনার মাকে যদি আপনি না বুঝিতে পারেন, আমার সাধ্য কি? আমার মাকে তাঁহার লোকান্তর হওয়ার পর বুঝিয়াছি, তিনি জীবিত থাকিতে বুঝিতে পারি নাই। স্বাস্থ্যের অভাব অর্থাৎ দ্রব্যের অভাব হইলে তবে তাহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝা যায়। ব্যাধি

হইলে বুঝিলাম, স্বাস্থ্য কি জিনিষ, প্রকৃতি কি, প্রকৃতির বিকৃতিই বা কি? স্বাস্থ্যই প্রকৃতি, প্রকৃতির বিকৃতি ব্যাধি। প্রাকৃতিক গ্রন্থখানির সেই মহান্ রচয়িতা এমনভাবে গ্রন্থখানির রচনা করিয়া রাখিয়াছেন যে যতই উহা পাঠ করা যাইবে, ততই প্রাকৃতিক বিষয়ে অধিক জ্ঞানলাভ হইবে। চিকিৎসার অধ্যায় যদি পড়িবেন, তবে আপনাকে প্রাণি-জগতে বিচরণ করিয়া দেখিতে হইবে, প্রকৃতি কেমন করিয়া জীবকে আরোগ্য করিতেছেন। তিনি যে উপায়ে অন্যান্য জীবকে আরোগ্য করেন, আপনাকেও সেই উপায়ে মনুষ্যকে আরোগ্য করিতে হইবে। কারণ প্রকৃতির নিয়মের এক ধারা,—জীবের পক্ষে যা, মনুষ্যের পক্ষেও তা।

প্রকৃতিতে ব্যাধি নাই, প্রকৃতির বিকৃতি হইলেই ব্যাধি। মনুষ্য ব্যতীত অন্যান্য জীব-জগত দেখুন, তাহাতে ব্যাধি ও অকাল মৃত্যু একবারে নাই। পশু বলুন, পক্ষী বলুন, সরিসৃপ-কীট-পতঙ্গ বলুন, কেহই ব্যাধির দাস নয়, কাহারও মাথা ধরে না, পেটের অসুখ হয় না, সকলেই স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিয়া, কাল পূর্ণ হইলে আনন্দে দেহত্যাগ করে, আর সে দেহত্যাগে যত সুখ, মানুষের ভাগ্যে জীবনকালে তত সুখ হয় কিনা সন্দেহ। মানুষের জ্ঞান আছে যে তাঁহারা মহাজ্ঞানী জীব। কিন্তু আইসুন পশুর জ্ঞানের সহিত মানুষের জ্ঞানের তুলনা করিয়া দেখা যাউক। যে জাতীয় জীব যে জিনিষ খায় না, বা যাহা করে না, তাহাকে তাহা খাওয়াইতে কিম্বা করাইতে কোন জীবেরই সাধ্য হইবে না, কিম্বা সে নিজে হইতে জাতীয় নিয়মের ব্যত্যয় করিবে না, আপনার প্রকৃতিতে আপনি স্থির থাকিবে। আর এক জন মানুষ তাহার চৌদ্দ পুরুষে যাহা খায় নাই বা করে নাই এবং তাহা খাইলে বা করিলে পাপ করা হইবে, এ জ্ঞান সত্ত্বেও, সে হয়

অনুরোধে নয় প্রলোভনে, তাহা খাইতে কিম্বা করিতে পারে। ইহা হইতে, আপনারা কাহার জ্ঞানের উৎকর্ষতা দেখিলেন, মানুষের পিছু পিছু ব্যাধিরূপী সয়তান ফিরিতেছে, একটু জ্ঞানে কম দেখিলেই, সয়তান মানুষকে প্রাকৃতিক পথ হইতে বিচ্যুত হইবার পরামর্শ দেয়। মনুষ্য তাহাতেই ভুলে। যে কেহ ব্যাধি হইতে আত্মরক্ষা করিতে চান, তাঁহাকে আমিরা সতত জ্ঞানকে জাগরূক রাখিবার পরামর্শ দেই। দিবা রাত্র ভাল মন্দ অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া কার্য্য করিতে হইবে। ভাল মন্দ চিকিৎসকে একবার কি দুইবার বলিয়া দিতে পারে। আর সমস্ত বিষয়ের ভাল মন্দ চিকিৎসক বলিয়া দিতে সকল সময় সক্ষম হইবে কি না, তাহাও সন্দেহস্থল। যে সকল রোগী নিতান্ত ব্যাধি-বিহ্বল কিম্বা অল্প বয়স্ক, তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে একজন জ্ঞানযুক্ত মনুষ্য থাকা উচিত। সে-ই তাহাদের পক্ষে কি ভাল, কি মন্দ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করাইবে। এ জীবন 'নহে ত তৃণ দল' কিম্বা 'ভেসে আসা ফুল ফল।' শরীরে ব্যাধি আনা মানুষের পক্ষে সহজসাধ্য। বড় কঠোর না করিলে, ব্যাধি দেহ হইতে বাসা তুলিতে চায় না। এই মানুষের আদিতে কোন ব্যাধিই ছিল না। এক্ষণে সয়তানের কুহকে, ব্যাধি ভিন্ন জীব জগতে দুর্লভ হইয়াছে। তাই সংস্কৃত প্রচলন—শরীরং ব্যাধি মন্দিরং।

সেণ্ট পলের একটা কথা ব্যাধিত মানুষের পক্ষে বেশ প্রযুক্ত হইতে পারে; তাহা এই, "The good, that I would, I do not; but the evil, which I would not, that I do." মানুষ বেশ জানে, রাত্রিকাল ঘুমাইবার সময়, জীব-জগত গভীর নিদ্রায় মগ্ন, এমন কি, উদ্ভিজ্জগতও শাখা শ্লথ করিয়া নিদ্রাভিভূত, আর সেই সময় আমাদের পার্লামেণ্ট মহা

লক্ষ্য না করিলে, জগত অচল হয়! নিমন্ত্রণের বার আনা খাইতেই আমাদের উদর পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, ক্ষণিক সুখের জন্য, অবশিষ্ট সিকি গলাধঃকরণ করিতেই হইবে, তখনই আমাদের শারীরিক পাপ অর্জিল, ঐ পাপের শাস্তিই ব্যাধি-ভোগ। পাপের মাত্রা কিম্বা প্রাকৃতিক নিয়মের অপালন যে পরিমাণ আমরা করিব, ব্যাধি ভোগের কাল ও ব্যাধির যাতনা আমাদের তদনুরূপ হইবে। ব্যাধির সময়ও প্রকৃতি আমাদের ব্যাধি আরোগ্যের জন্য যথেষ্ট করেন। কিন্তু সকল কার্য্যেরই একটা সীমা আছে। যখন আমাদের ব্যাধির পরিমাণ, আরোগ্যকারী ক্ষমতার অপেক্ষা অধিক হয়, তখনই মানুষের মৃত্যু হয়। এ আরোগ্যকারী ক্ষমতার অন্য নাম জীবনী-শক্তি।

ব্যাধি জিনিষটা মানুষের স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি। প্রাকৃতিক নিয়মে যত দিন মনুষ্য চলিয়াছিল, তত দিন ব্যাধির সৃষ্টি হয় নাই, প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম করাতে জগতে ব্যাধি দেখা দিল। অন্যান্য জীবে প্রাকৃতিক নিয়মের অপব্যবহার শীঘ্র করিতে চাহে না, তজ্জন্য তাঁহাদের ব্যাধিও শীঘ্র হয় নাই। মনুষ্যের দ্বারা তাহাদের শরীরে ব্যাধি-বীজ প্রবিষ্ট হইয়াছে। যে সকল জীব মনুষ্যের সহবাসে থাকে, তাহারাই ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছে। যাহারা মনুষ্য হইতে দূরে আছে, তাহারাই ভাল আছে। গরু, ছাগল, বিড়াল, কুকুর প্রভৃতি কতকগুলি জীবের লোকালয়ই একমাত্র বাসস্থান। মনুষ্য তাহাদিগকে ব্যাধি উৎপাদক খাদ্য খাওয়ায়, ব্যাধি হইতে পারে, এমন ভাবে রাখে, এই জন্য তাহাদের মধ্যে ব্যাধি হইতে দেখা যায়। কিন্তু ঐ সকল জীব আরোগ্য হইবার প্রক্রিয়াও জ্ঞাত আছে, কুকুরে উপবাস দেয়, বিড়ালে কাঁচা ঘাস খাইয়া উদরস্থ দূষিত খাদ্য উদগীর্ণ করে।

কিন্তু মানুষের বিজ্ঞানের এ সকল দেখিয়া শুনিয়াও রাত্রে ঘুম হয় না। তাহারা পশু চিকিৎসার জন্য কত রকমই না বিভৎব ঔষধ ও প্রক্রিয়া আবিষ্কার করিতেছে; কত ডাক্তারকে প্যাণ্টকোটে সাজাইয়া বাহির করিতেছে! দেশে গাছ গাছরার টোট্‌কা দিয়া যে সকল পশু চিকিৎসার প্রথা ছিল, তাহাও লোকে ভুলিয়া যাইতে চলিয়াছে, কিম্বা অত ভেজালে না গিয়া, ডাক্তারী ঔষধই ব্যবহার করিতেছে। কথা আছে, গরু পুষিতে হইলে গরু হইতে হয়, তবে গরুর দুখ দরদ জানা যায়। আমরা কেবল চাই, 'সাধনা বিনা সিদ্ধি।' সুখটুকু করিয়া, কষ্টের বেলায় সরিয়া দাঁড়াইব। মানুষ যে স্থানে থাকে, তথাকার মাটি ব্যাধি-রসে আর্দ্র হয়, মানুষের মাথার উপরের আকাশে ব্যাধি-কীটাণু ঘুরিয়া বেড়ায়। সেইজন্য মানুষের নিকটস্থ জীব সকল ব্যাধিক্রান্ত হইয়া থাকে। এমন কি, তথাকার উদ্ভিদেরাও ব্যাধি-স্পৃষ্ট, তাহারা উচিত মত ফুলফল দেয় না, কেহ জীর্ণ শীর্ণ, কেহ বা কীটনষ্ট পত্র-শাখ। আপনারা মশাকে মেলেরিয়ার কারণ বলেন; মশাই আপনাদের ক্ষতি করিতেছে, কি আপনারাই মশার ব্যাধির কারণ হইতেছেন, তাহা মেলেরিয়া প্রবন্ধে দেখান যাইবে। সকল দেখিয়া শুনিয়া আমরা বুঝিতে পারিয়াছি, মানুষ আপনার পায়ে, আপনি কুঠার মারিতেছে। মানুষ ব্যাধি-শত্রুকে ডাকিয়া আনিতেছে।

যে ব্যক্তির যেরূপ প্রকৃতি অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবন পরিচালনের রীতি তাহার বিকৃতি অর্থাৎ ব্যতিক্রম হইলেই ব্যাধির কারণ হয়। এক ব্যক্তির দিবা নিদ্রা অভ্যাস নাই, সে যদি দিনে ঘুমায়, তবেই তাহার প্রকৃতিগত নিয়মের ব্যতিক্রম হইল, তখনই ব্যাধি আসিয়া তাহার শরীরে স্থান লইল। ন দিবা শাপ্সি। জগত কর্ম্মের স্থান, ভাস্যমান ও

দিবালোক জীব-জগতকে কর্ম্মের জন্য সতত আহ্বান করিতেছেন। প্রকৃতির এ আহ্বানকে কখন কেহ যেন অবহেলা না করেন, প্রকৃতির রজনীচারী জীবগুলির অনুকরণ মানুষ যেন না করেন ; ঐ সকল জীব প্রকৃতির কি উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে, তাহা বিবেচনা সাপেক্ষ। ব্যাধি-বীজ শরীরে পড়িলে তাহাকে নষ্ট করিবার চেষ্টা প্রথম হইতেই করা উচিত। নতুবা ঐ বীজ কালে শাখা প্রশাখা লইয়া বৃক্ষে পরিণত হয়। স্নায়ু মণ্ডল (nervous system) আহত হইলেই শরীরে ব্যাধি-পদার্থ জমিতে থাকে। স্নায়ুমণ্ডল অসংখ্য কারণে আহত হইয়া থাকে। পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে আঘাত আমাদের স্নায়ুমণ্ডলে প্রবিষ্ট হয়। স্নায়ুমণ্ডল হইয়া ঐ আঘাতের ফল, ব্যাধি-পদার্থরূপে শরীরে দেখা দেয়। ব্যাধি পদার্থই ভাবী ব্যাধির জনক। মনে করুন, নাসিকা দিয়া মলের দুর্গন্ধ কি আইডোফরমের তীব্র ঘ্রাণ আপনার শরীরে প্রবেশ করিয়া আপনার স্নায়ুকে আলোড়িত করিল, ঐ ঘ্রাণই আপনার ভবিষ্যত ব্যাধির কারণ হইল। এইরূপে, চক্ষুতে কোন ভয়াবহ ঘটনা দেখিলে, কিম্বা কর্ণে কোন বিকট শব্দ শুনিলে, কিম্বা ত্বকে কোন আঘাতে, ব্যাধির কারণ হয়। মুখ গহ্বর দিয়া ত কত রকম ব্যাধি-বীজ প্রবেশ করিতেছে, তাহার উল্লেখ করা বাহুল্য। প্রত্যেকের শরীরের সকল বিষয়েরই একটা মাত্রা বাঁধা আছে, ঐ মাত্রার এদিক ওদিক হইলেই ব্যাধির কারণ হয়। আপনি তরকারীতে যে পরিমাণ নুণ খান, তাহার বেশী হইয়া তরকারীটি নুণে পুড়িলে আপনার স্নায়ুমণ্ডলে আঘাত পড়িবে, আবার আলুণে হইলেও আপনার কষ্টবোধ হইবে, কষ্টেও স্নায়ুমণ্ডল আহত হয়।

তাই বলি, আপনার প্রকৃতিতে আপনাকে স্থির থাকিতে হইবে। বেশী অগ্রপশ্চাৎ হইতে পারিবেন না। দেখিলেন, ঘুণে পোড়া খাইলে, কিম্বা আলুণে খাইলে আপনার ব্যাধি হইল। কিন্তু ঘুণে পোড়া, কিম্বা আলুণে খাওয়া যাহার অভ্যাস, তাহার কিছুই হইল না। কারণ তাহার প্রকৃতিই ঐরূপ, উহা তাহাদের প্রকৃতির বিকৃতি নহে। ব্যক্তিগত প্রকৃতি বিভিন্নরূপ হইতে পারে, কিন্তু দ্রব্যের গুণ একরূপই হয়। মানসিক আঘাতের লঘুত্ব ও গুরুতা অনুসারে ব্যাধির তারতম্য হয়। আর ব্যাধি যত দীর্ঘকাল শরীরে স্থায়ী হয়, ততই ব্যাধি সারাইতে অধিক সময় লাগে। যখনই স্নায়ুমণ্ডল আহত হইল, তখনই শরীর ব্যাধির কারণ কিম্বা ব্যাধিক্ষেত্র হইল। কিন্তু যাহার শরীর সে তখন কিছুই বুঝিতে পারিল না। তারপর আরোগ্যকারী শারীরিক কিম্বা প্রাকৃতিক শক্তির সহিত যখনই তাহার শরীরস্থ ব্যাধি-পদার্থের সংমিশ্রণ হইল, তখনই জ্বর কি কফ ইত্যাদি রোগ বাহিরে দেখা দিল। তখন যে রোগ হইয়াছে, তাহা রোগী ও অন্যান্য লোকে বুঝিল, এই আরোগ্যকারী শক্তির ক্রিয়ার নামই রোগ। আপনি বলিবেন, আজ আপনার জ্বর হইয়াছে। আমি বলিব, আপনার জ্বরের কারণ যে দিন হইতে হইয়াছে, সেইদিন হইতেই আপনার জ্বর হইয়াছে, সেইদিন হইতেই আপনার শরীর ভার, কি এক অব্যক্ত যাতনায় সেইদিন হইতেই আপনি ভুগিতেছেন, আজ আপনার জ্বর হয় নাই, আজ আপনার জ্বর-নির্গম হইয়া আপনার ভবিষ্যত মঙ্গল হইতেছে। এইরূপে সকল ব্যাধিতেই আমরা সেই সেই ব্যাধি হইতে রোগী মুক্ত হইতেছে, একরূপ বলিয়া থাকি। আপনি বলিবেন, তেঁতুল খাওয়ায় আপনার জ্বর হইয়াছে।

আমি বলিব, রাম, হরি, কালী, ও আপনি চারি জনে এক সময়ে, এক গাছের তেঁতুল খাইলেন, তাহাদের তিন জন বেশ আছে, আর আপনি জ্বরে পড়িলেন। তেঁতুলে যদি জ্বর থাকিত, তবে তাহাদেরও জ্বর হইত। তেঁতুল জ্বরের কারণ নয়। আপনার ব্যাধিগত শরীর বলিয়া, উহা তেঁতুল রূপ প্রাকৃতিক বস্তুর সংমিশ্রণে আসাতে, জ্বর বাহির হইয়া পড়িয়াছে; তাহা হইলে আপনার শরীরই জ্বরের কারণ।

আপনার দেহের স্নায়বিক স্রোতকে নদীর ধারার মত বহিয়া যাইতে দিউন। ঐ স্রোতে স্বার্থসিদ্ধির জন্য যথেচ্ছ অপচার করিয়া, উহার জল আন্দোলিত ও উৎক্ষিপ্ত করিবেন না। সতত ধীর জ্ঞানে প্রতি মুহূর্ত্তে কার্য্য সাধন করুন। তাহাতে সুস্থ থাকিবেন ও ব্যাধিমুক্ত হইবেন।

শরীরে ব্যাধি-পদার্থ জমিলেই, শরীরের স্বাভাবিক লাবণ্য নষ্ট হইতে আরম্ভ করে। শরীর কদাকার ও কৃষ্ণবর্ণ হইলেও, শরীরে যদি স্বাস্থ্য থাকে, তবে চেহারা দেখিতে ভাল লাগিবে। কেন, কালার রূপে যাটি সহস্র সুন্দরী ভুলিয়াছিল, তাহা কি আপনারা জানেন না! স্বাস্থ্যই সৌন্দর্য্য। বৃদ্ধ হউক, যুবা হউক, যাহার স্বাস্থ্য আছে, সেই সুন্দর। আর স্বাস্থ্যহীন যুবকও দৃষ্টিকটু, শরীরে ব্যাধি-পদার্থ হইলে, শরীরের সমতা নষ্ট হইয়া যায়। মাপিয়া দেখিলে, ডান হাতের বেড় অপেক্ষা, বাম হাতের বেড় বড় হইবে বা বাঁ গাল ডান গাল অপেক্ষা কিছু ফোলা ফোলা, ইত্যাদি অসামঞ্জস্য শরীরে পরিলক্ষিত হইবে। এক জনের দেহে এক দিনে ব্যাধি-পদার্থ জমে না। ব্যাধি পদার্থ কেহ বা পিতা মাতা হইতে প্রাপ্ত হয়, কেহ বা বৎসরের পর বৎসর অত্যাচার করিয়া উপার্জ্জন করে। মাধ্যাকর্ষণের নিয়মে, রোগী যে কাত হইয়া শোয়, সেই দিকে

স্বভাবতঃ ব্যাধি-পদার্থ জমিবে। যে রোগী ডান কাতে শুইবে, তাহার দক্ষিণ গণ্ড, দক্ষিণ বক্ষ, দক্ষিণ উরু ব্যাধি-ভারাক্রান্ত হইবে; সেই স্থানে ও সেই দিকের অভ্যন্তরীন্ যন্ত্রের পীড়া হইবে। যেমন ডান কাতে শোওয়া রোগীর যকৃতের অসুখ হইতে পারে। শরীরে ব্যাধি-পদার্থ জমিলে বোধ হইবে, 'এ দেহ আপন নয়।' তখন কোষ্ঠকাঠিন্য কিম্বা পেটের অসুখ হইবে, গায়ের ত্বক শুষ্ক দেখাইবে, আমি যাহা চাহি না, এরূপ সকল লক্ষণ পরিলক্ষিত হইবে। ব্যাধি-পদার্থ শরীরের অংশ নয়, বা যন্ত্র নয়, উহা 'উড়িয়া আসিয়া যুড়িয়া বসা' জিনিষ। উহার থাকিবার কেন্দ্রস্থান তলপেট। তলপেট হইতে উহা সর্ব্ব শরীরে ঘুরিয়া বেড়ায়। কখন পায়ের গিঁঠে যাইয়া গিঁঠে বাত হইতেছে, কখন মাথায় উঠিয়া আমাদিগকে আধ-কপালীর যন্ত্রণায় অস্থির করিয়া তুলিতেছে, ইত্যাদি।

ব্যাধি-পদার্থ ও তাহার গতিবিধি সম্বন্ধে জ্বরের অধ্যায়ে বিশেষরূপ লিখা হইবে। এক অধ্যায়ে অধিক লিখিলে, পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতির ভয় করা যায়।

নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম।

রাত্রির শেষে, পাখীরা যখন ডাকিয়া উঠে, তখনই শয্যাত্যাগ করিতে হয়; পাখীর ডাকই, প্রকৃতির, মানুষের ঘুম ভাঙ্গাইবার ডাক। ঘুমন্ত মানুষের অপেক্ষা জাগরিত মানুষের উপর বাহ্য প্রকৃতির ক্ষমতা অধিক। পাখীর গান, ভোরের দৃশ্য, প্রভাত বায়ু, এই সকল বাহ্য প্রকৃতি; আর শারীরিক আভ্যন্তরিন্ ও অদৃশ্য ক্রিয়া, অন্তঃপ্রকৃতিতে করে। বেলা হইলে উঠিলে, শরীরের কষ্টকর ভাব হয়, আর মনকষ্ট ও লজ্জাও বোধ হয়, এ সকল মানবের উপর প্রকৃতির শাসন। সুস্থ লোকে রাত্রির শেষে ও ভোরে পাঠ ও কাজ করিতে পারেন, অসুস্থ লোকের ঐ সময় ভাল এবং অল্প চিন্তা করিয়া ও ভ্রমণাদি লঘু পরিশ্রম করিয়া কাটান উচিত। যাহারা খুব অসুস্থ, নিশ্চিন্ত ও সুস্থির হইয়া থাকাই ঐ সময় তাহাদের উচিত। প্রাতরুত্থান ব্যাধি আরোগ্যের সুন্দর উপায়। ইহা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। সকল ঋতুতেই সকালে উঠার দরকার। অনেকে পরের কথায় cold catch করিবার ভয় করেন, কিন্তু সাহস করিয়া প্রাতরুত্থিত হইলে, তাঁহাদের কাল্পনিক ভয়ের বিপরীত ফল ফলিতে দেখিবেন।

আঁধার আঁধার থাকিতে গাছের তলায় শৌচে যাওয়া উচিত। মল না দেখার জন্য অন্ধকার কথার উল্লেখ করিলাম, মল দেখাতে মনেও বিকৃত ভাবের উদয় হয় এবং সেই মানসিক বিকৃতি মনের ভাব পরিস্ফুট

হইয়া উঠে। তাহাও দেখা গিয়া থাকে। গাছতলায় গাছের স্বাভাবিক গরমও পাওয়া যায়, বাতাসও কিছু কিছু লাগে. এইজন্য অসুখ লোকের গাছতলায় যাওয়া উচিত। বাহ্যের ইচ্ছা না হইলে, শুধু নিয়ম রক্ষা করিবার জন্য, বসিয়া থাকা ভাল নয়। কোন স্বাভাবিক কার্য্যই বন্ধ করিতে নাই। বাহ্য কিম্বা প্রস্রাবের ইচ্ছা হইল, অন্য হাজার কাজ ত্যাগ করিয়া, তাহা সম্পন্ন করিবেন। এইরূপ বায়ু নিঃসরণ, কাশি, হাঁচি, কিছুরই গতিরোধ করিতে নাই। সভাসমিতিতে দেখিতে পাই, অনেকে কাশি ও হাঁচি চাপিয়া রাখেন। ইহা কি ভাল? বমি বমি গা করিলে, এটা ওটা খাইয়া বমন বারণ করাও তদ্রূপ। শৌচের সময় তাড়াতাড়ি করিতে নাই; বেগাদি দিতেও নাই, বেগ দিলে আভ্যন্তরীন যন্ত্রেরা আহত হয়। যন্ত্রের দোষ হইলে, হজম ভাল হয় না, তাই কোষ্ঠশুদ্ধিরও দোষ ঘটে। কোষ্ঠশুদ্ধ না হইলে এক আধ দিন সহ্য করিয়া থাকিবেন, তারপর আপনিই হইবে। পেটের অসুখ হইলেও কখন ঔষধের দ্বারা বাহ্যে বন্ধ করিবেন না, বরং খাওয়া বন্ধ করিবেন। যাহার শরীরে ব্যাধি-পদার্থ আছে, তাহার শৌচের বেগ বেশী হয়, অর্থাৎ দ্রুতপদে তাহাকে বাহ্যে যাইতে হয়। তাহার মলে বড় দুর্গন্ধ; মল হয় ঢিলে ঢিলে, নয় শক্ত হইলে, শুষ্ক; আর বাহ্যে শেষ হইলে, মনে হয়, বাহ্যে ভাল হইল না, আরও হইত এবং গুহ্যদ্বারে মল লাগিয়া থাকে. কাহারও কাহারও গুহ্যদ্বার জ্বালা করে। অসুস্থ লোকের আবদ্ধ মলের রং কাল হয়, আর অজীর্ণ মলের রং সাদাটে বা হলদে হয়। শ্লেষ্মার মত মল পড়া ভাল, তাহাতে সঞ্চিত ব্যাধি-পদার্থ নির্গত হইতেছে, জানিতে হইবে। ব্যাধি-পদার্থ কথাটা বড়. এইজন্য উহাকে মল নামে

অভিহিত করিব, মলের বিশেষ-অর্থ পুরীষ, কিন্তু সাধারণ অর্থ শরীরের যে কোন মল। শরীরের এক স্থানে বাত জমিয়া উঁচু হইয়া আছে. ঐ বাতকে মল বা মলীয় পদার্থ বলিব। যে জীবের গুহ্যদ্বারের ভিতরের মলাধারের আকৃতি যেমন, তাহার মলের আকৃতিও তেমনি হয়। স্বাভাবিক মল গরুর পাকান পাকান, ছাগলের গুঁটিগুটি, ইত্যাদি। মানবের স্বাভাবিক মলের চেহারা হইবে, লম্বা (দৈর্ঘ্যে) ও প্রায় গোলাকার (বেড়ে)। ঐ মলের রং কটা কটা, আর মলের বাহিরটা তৈলাক্ত। সে মলে বেশী দুর্ঘাণও ছাড়িবে না, কিম্বা ভাক্ষত কোন পদার্থ, তদবস্থায় দেখা দিবে না। বাঙ্গালীর পায়খানা জীবন্ত নরক, দুষ্ট ও তীব্র গন্ধ, কষ্টদর্শন আকৃতি, বায়ুশূন্যতা ও অন্ধকার ভাব, সর্ব্বইন্দ্রিয়কে এক-কালীন আলোড়িত করিয়া ব্যাধির কারণ হয়। সহরবাসীর ইহা এক মাত্র শৌচের স্থান; নাগরিকেরা ২।১ মাইল গিয়া শৌচ ক্রিয়া করিতে আলস্য বোধ করে; কিন্তু পশ্চিম দেশীয়েরা কেহ কেহ আনন্দ সহকারে এ কষ্টটুকু স্বীকার করে। স্বাভাবিক প্রস্রাবে বেশী বেগ হয় না, পরিমাণে কম কি বেশী হইবে না, রং সাদা হইবে, প্রস্রাবের স্থান শুখাইলে দুর্গন্ধ বেশী হইবে না, প্রস্রাব করার পর বেশী টোপে টোপে পড়িবে না। অসুস্থ লোকের মলীয় প্রস্রাব হওয়া ভাল। উহা লাল রং হইবে এবং ঘন হইবে, এরূপ প্রস্রাব হইলে, শরীরে আরাম বোধ হইবে। মাটির উপর ক্লেদ (মল মূত্রাদি) পড়িলে, রোগের কারণ কম হয় এবং দুর্গন্ধও কম হয়; ইটে বাঁধা ও সিমেণ্টের উপর পড়িলে, পূর্ব্বোক্ত উভয় দোষ বেশী হয়, এইজন্য এই সকল স্থান সতত পরিস্কৃত করা উচিত। মাটিতে দূষিত পদার্থ পড়িলে নিম্নগতি প্রাপ্ত হয় ও ঊর্দ্ধগতিতে অল্পেই

দূষিত বাষ্প উঠে। পাকা কিম্বা বাঁধা স্থানে নিম্ন-গতি রহিত হইয়া কেবলিই উৰ্দ্ধ-গতিকে বাষ্প উঠিতে থাকে। মাটি 'সর্ব্বং সহাং,' পৃথিবীর অনেক দোষ সারিয়া লইতে পারে।

মুখ প্রক্ষালন, দন্তধাবন জীব-জগতে নাই। জীব অস্বাভাবিক আহারও করে না, ও সকলের দরকারও হয় না। তাহাদের মুখে দুর্গন্ধ হয় না, দাঁতও সতত চক্‌চক্ করে ও জিহ্বাতেও পলি পড়ে না। মানুষের এ সকল কাজ করা, অর্থাৎ মুখাদি ধোওয়া বিশেষ দরকার। সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বে, এ কাজ করিতে হয়। নিজের বা অন্যের, এ সকল ক্লেদ নিষ্কৃতি দেখা ভাল হয় না। ব্যাধিযুক্ত দাঁতে পাথরের মত চটা উঠে ও খাদ্য দ্রব্যের ভগ্নাংশ প্রবিষ্ট হয়, কাহারও কাহারও বা দাঁতের গোড়া দিয়া রক্ত পড়ে। ভোজনের সময় চর্ব্বণ বিশেষরূপে না করাতে এ সকল দোষ হয়, রীতিমত চর্ব্বণ করিলে, দাঁতও ভাল থাকে, খাদ্যও ভাল জীর্ণ হয়। আহারের পর যে আমরা পান চিবাই, উহা আহার-কালীন চর্ব্বণের ত্রুটি সংশোধন উদ্দেশ্যে। জীবেরা যেমন জিহ্বা ঘুরাইয়া দাঁতের পরিচ্ছন্নতা সম্পন্ন করে, ঐরূপ করিলে, দন্ত প্রবিষ্ট দ্রব্য বাহির হয় ও জিহ্বা হইতে লালা নির্গত হইয়া, হজমের আনুকূল্য করে। সে যাহা হউক, যিনি শুধু জল দিয়া মুখ পরিষ্কার করেন, তিনি যতক্ষণ দন্ত, জিহ্বা প্রভৃতি সম্পূর্ণ পরিষ্কার না হইবে, ততক্ষণ অঙ্গুলী দিয়া ঘর্ষণ করিবেন। ঘর্ষণের দ্বিতীয় উপকারিতা জীবনী-শক্তি বৃদ্ধি। আহারের পর ও সকালের মুখ ধোয়ার পর দন্ত-কাষ্ঠ (খরিকা) করা উচিত, কারণ দাঁতের ভিতর কিছু থাকিলে, হজমের ত্রুটি হয়। দাতন কোন খাদ্য ফল গাছের (পেয়ারা প্রভৃতি) হইলেই ভাল হয়। জামালগোটা

প্রভৃতি আগাছার দাঁতন স্বাদে ও ঘ্রাণে তত ভাল নহে। Tooth powderএর ব্যবহার করা যে, প্রাকৃতিক নিয়মের বহির্ভূত, তাহা সকলেই বুঝিতেছেন। মাটি দিয়া ও ছাই দিয়া দন্ত পরিষ্কার করা, tooth-powder ব্যবহার করা অপেক্ষা সহস্র গুণে ভাল। সাঁওতালেরা সাপ ব্যাঙ খায় সত্য, কিন্তু উহাদের স্ত্রীলোকেরাও আমাদের পুরুষের অপেক্ষা ভাল ও অধিকক্ষণ দন্তধাবন করে।

(ক) পরিশিষ্টে প্রয়োগের অধ্যায়ে স্নান সম্বন্ধে যথেষ্ট বলা হইয়াছে। আরও যাহা বক্তব্য আছে, তাহাই এক্ষণে সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে। প্রয়োগের অধ্যায়ে, নিয়মগুলি ১।২ ইত্যাদি চিহ্নের দ্বারা লিখিত হইয়াছে এবং নিয়মের পর ২।১ প্যারা করিয়া উক্ত নিয়মের সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে। পাঠকের এ বিষয় স্মরণ রাখিয়া প্রয়োগ পাঠ করা উচিত। পাঠক প্রয়োগের নিয়মগুলি শুধু গ্রন্থপাঠ করিয়া, নিজে নিজে করিবেন না। যদি প্রাকৃতিক চিকিৎসায় চলিতে ইচ্ছা করেন, আগে আমাদিগের দ্বারা ব্যবস্থিত হইয়া, তারপর গ্রন্থের নিয়ম অনুসারে চলিবেন, কারণ রোগীর অবস্থা অনুসারে, কোন রোগীর কোন্ কোন্ প্রয়োগ লওয়া দরকার, তাহা বিবেচনা করিতে হয়।

সাদা চামরা অপেক্ষা কাল চাম্‌রা জল, বাতাস, ঠাণ্ডা, এ সকল বেশী আদর করে। শূকর ও মহিষ, জলকাদায় পড়িয়া থাকিতেই ভালবাসে। চামরার রং কাল সাদা হওয়া, শীত ও গ্রীষ্মের তারতম্যে হয়, শীতপ্রধান দেশের লোকের গায়ের রং সাদা, আর গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোকের কাল রং। সে যাহা হউক, সাহেব অপেক্ষা বাঙ্গালীর স্নানটি নিত্য ও অবশ্য-করণীয় জিনিষ। আজকাল যেরূপ দিন কাল পড়িয়াছে, তাহাতে কাদা

মাখিলে লোকে বাতুলাশ্রয়ের অধিবাসী মনে করিতে পারে। কিন্তু আমাদের পূর্ব্বকর্ত্তারা 'অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে' বলিয়া কাদা মাখিতেন, তাহা কি কাহারও মনে নাই? তাঁহারা বিনা তেলে সকালে ও তেল মাখিয়া দোপরে স্নান করিতেন; এখন আতেলে ও দুইবার স্নান করিতে লোকে কত ভয় করে। লোকে তেল বলিয়া বড় ব্যস্ত হয়, কিন্তু অত ব্যস্ত হওয়ার কোন কারণ নাই, আমরা যে সকল জিনিষ খাই, উহা হইতেই শরীরের যতখানি তেলের দরকার, তাহা প্রায় পাওয়া যায়। বলুন ত কাঁঠালের গাছেরা ত তেল মাখে না, তবে তাহাদের পাতা এত তেল চক্‌চকে কেন? আমরা বহিরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে সকল কাজ করিতেছি। নাকে সুঘ্রাণ বোধ হইল, চোখে গোলাপী রং দেখিলাম, তেলের সঙ্গে যে বিজ্ঞাপন আছে, তাহাতে দশ কথা মানুষ ভুলান করিয়া লিখিয়াছে, তাহা পড়িলাম, আর এমনি পেটে না খাইয়াও এক শিশি তেল কিনিয়া ফেলিলাম। মাথার অসুখ, চুলের অকালপক্কতা, (মেয়ে মানুষের) চুল বড় হওয়া ও কাল হওয়ার জন্য বাজারের সুগন্ধ (?) ও medicated তেলের এত আদর। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এ সকল উপকার কি, ঐ সকল তেল হইতে পাওয়া যায়? তাহা ভাবিবার কথা। এ সকল তেল যে উপায়ে preserve করিয়া রাখা হয়, তাহা নিতান্ত অস্বাভাবিক। দ্বিতীয় কথা, এমন সব তেল বর্ত্তমান থাকিতে, বাঙ্গালী দিন দিন এত বিকৃত মস্তিষ্ক হইতেছে কেন? ফল কথা, ঐ সকল তেল এককালীন স্পর্শ না করাই, আমাদের মত। ফলজাত (নারিকেল) ও শস্যজাত (তিল, সর্ষপ) তেল ব্যবহার করা উচিত। যদি সুঘ্রাণে করিবারই সাধ হয়, তবে ফুল মিশাইয়া করা উচিত। স্নানের সময় গামছা দিয়া শরীর

ঘর্ষণ করিতে হয়। তৈল মর্দ্দন ও শরীর ঘর্ষণ, এ সকল করার দরকার। মর্দ্দন ও ঘর্ষণে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হয়, বৈদ্যুতিক শক্তিতেই জীবনী-শক্তি বৃদ্ধি করে, যতই জীবনীশক্তি বৃদ্ধি হইবে, ততই শরীর রোগমুক্ত ও দীর্ঘায়ু হইতে পারা যাইবে।

শৌচ ও স্নান সম্বন্ধে, লিখিয়াছি, তাহার পরেরই লিখিতব্য বিষয় আহ্নিক সম্বন্ধে। আহ্নিক বিষয়ে লিখিলে, লোকে মনে করিতে পারে, ইহা ধর্ম্মশাস্ত্র। চিকিৎসা শাস্ত্রও ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত, ইহা উল্লেখ করাই বাহুল্য। স্থান সংক্ষেপ বিধায় এবারে আহ্নিকের প্রসঙ্গ করিলাম না, ভগবান্ যদি দিন দেন, ভবিষ্যতে করিব।

বিজ্ঞান কথাটা বড় 'ভারিক্কি।' বিজ্ঞান শব্দ শুনিলেই লোকে মনে করে, জিনিষটা কষ্টবোধ্য হইবে, গতিকেই পিছপাও হইতে আরম্ভ করে। বাস্তবিক তাহা নহে, ভাল করিয়া জানার নামই বিজ্ঞান। বিজ্ঞান প্রকৃতির সম্পত্তি। ইহা সকলের জন্যই সমান—ইহার প্রাচ্য প্রতীচ্য নাই; যেমন বিলাতে বসিয়া তিনে তিনে যোগ করিলে ছয় হইবে, এখানে বসিয়া তিনে তিনে যোগ করিলেও সেই ছয়, বিলাতের জন্য সাত, এখানের জন্য পাঁচ, যোগ-ফল হইবে না। আমরা—ইংরাজী শিক্ষিতেরা বলি, আমাদের যত বিধি শাস্ত্রকর্ত্তারা করিয়া গিয়াছেন, তাহা বিজ্ঞান অর্থাৎ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানসম্মত নহে, উহা কর্ত্তাদের গোঁড়ামী, কিন্তু সেই পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যদি আমাদের কর্ত্তাদের প্রতিষ্ঠিত বিধিগুলির উপর একে একে ফেলিয়া দেখা যায়, তবে বুঝা যায়, সকলগুলিই বিজ্ঞান সম্মত। কিন্তু দেশে এত শিক্ষিত লোক আছেন, কেহই এ তথ্যের উদ্ধার করিতে যত্নপর নহেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে উদাসিন

দেখেন, তাঁহারা যেমন জানিতে পারিলেন, হিন্দুরা উপবাস করিয়া থাকে। অমনিই উপবাসের উপকারিতা অপকারিতা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। পরীক্ষায় উপকারিতা প্রতিপন্ন হইলেই, তাঁহার মত প্রচারিত করিতে লাগিলেন, তখন আমরা বুঝিলাম, উপবাস বিজ্ঞানসম্মত। দই, ঘোল পূর্ব্বে অপকার করিবার ভয়ে খাইতাম না, যেমন Bulgerian Theory বাহির হইল, অমনি দই, ঘোলের শ্রাদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলাম। কথাটা শুনিতে কানে ঠেকে বটে, কিন্তু অতি সত্য কথা, সাহেবেরা বলিলে তবে আমরা ভ্রাতাকে ভ্রাতা বলিয়া বিশ্বাস করি!

আমাদের খাওয়ার যে কয়টা সময় আছে, যতটা পরিমাণ ধরা আছে, যে যে দ্রব্য খাওয়ার প্রথা আছে, তাহা নড়চড় করিতে আমরা গররাজী। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মের অপালন করায় আমাদের ঐ ঐ সময় ক্ষুধা হয় না, ঐ পরিমাণ খাইতে কষ্ট বোধ করি ও খাদ্য দ্রব্যের অনেক জিনিষ অরুচি হয়, তবুও মামুলী প্রথা নষ্ট হইবার ভয়ে, আমরা জোড় করিয়া সেই সময় সেই পরিমাণ ও সেই সেই দ্রব্য খাই। তজ্জন্য আমাদের যন্ত্র সকল ক্রমশঃ পীড়াযুক্ত হইয়া পড়ে। পীড়িত যন্ত্রের দ্বারা রীতিমত কাজ হয় না। পূর্ব্বে আমার ফুসফুসে যতবার বায়ু গ্রহণ ও নিঃসরণ করিত এবং আমার পাকস্থলী যত সময়ে, যে প্রকৃতির যতখানি দ্রব্য পরিপাক করিত, এখন ঐ সকল যন্ত্র তত পারে না। মানুষের অসুখ হইলে যেমন হয়, আভ্যন্তরিক যন্ত্রেরও ঠিক তেমনি হয়। তাহারাও কাজ করিতে অপারক হয় এবং আকারে শীর্ণ কিম্বা স্ফীত হইয়া পড়ে। পীড়িত মানুষের ন্যায়, ঐ সকল যন্ত্রকে এই সময় অল্প কর্ম্ম কিম্বা এককালীন অবকাশ দেওয়া উচিত। খাদ্যের বাঁধা পরিমাণ ও লঘু খাদ্য খাইলে, তবে তাহাদের কাজ

কম হয় ও উপবাস করিলে তবে তাহারা এককালীন বিশ্রাম পায়। বিশ্রামের সুখটা আমারা নিজে যতখানি বুঝি, যন্ত্রদের সম্বন্ধে তত বুঝি না, ইহা বড় দুঃখের কথা। শনিবারে চাঁদ না দেখা দিয়া রবিবারে চাঁদ দেখা দিলেন, সোমবারটা ছুটি পাইলাম, আর আমাদের আনন্দ ধরে না, কিম্বা স্কুল যাইবার পথে জল আসিল, একটা rainy day পাইলাম তাতেই না কত আনন্দ! যিশুখৃষ্ট ৬ দিন কর্ম্মের ও ১ দিন বিশ্রামের জন্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন, শাস্ত্রকারেরাও বিদ্যার্থীর জন্য কত দিনের অনধ্যায়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এইরূপ সকল কর্ম্মেরই বিশ্রাম আছে। আবার কর্ম্ম কঠিন হইলে তাঁহার বিশ্রামও তদনুরূপ দীর্ঘ ও অধিক উপভোগযোগ্য করা হইয়া থাকে। কিন্তু এ হতভাগা মহোদয়ের হাজা-শুখা নাই, কর্ম্মের কামাই ও বিশ্রাম নাই, খাটো—আরও খাটো, খাও—আরও খাও, হজম করিয়া দেও—হজম করিয়া দেও! কত খাটিবে, কত খাইবে, কত হজম করিবে, শেষে একদিন অবসন্ন হইয়া ভরা গাংয়ে তরী বুড়াইল।

ব্যারাম লোকের সমস্ত শরীরময় ব্যাধি-মল থাকে। প্রত্যেক যন্ত্রের ভিতরে বাহিরে, তলপেটে, মাথায়, হাতে পায়, শরীরের সকল জায়গায়ই আছে। তবে তলপেটটাই ব্যাধি-মলের ভাণ্ডারখানা। শরীরের অন্যান্য স্থানে এখান হইতেই মল চলাচল করিয়া থাকে। শরীরের যন্ত্র সকলের ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যাহাকে দুর্ব্বল পায়, সেইস্থানেই মল দাঁড়াইয়া যায়। যত দিন যায়, ততই এই দাড়ান মল সেই স্থানে শিকড় গাড়িয়া স্থায়ী হয়, রংয়ে কাল হয়, তরল মল কঠিন হইতে কঠিনতর হয়, তখন মলের স্থানের ব্যাপকতাও হ্রাস হয়। একজন বলে, আমি বুকে মধ্যে মধ্যে

বেদনা বোধ করি, আর একজন বলে, আমার ডান উরুর মধ্যে সময় সময় বড় কন্‌কন্‌ করে, আর একজন কথন কথন ঝাপ্‌সা দেখে। এ তিন জনেরই যথাক্রমে বুকে, উরুতে, চোখে মল দাঁড়াইয়াছে। তবে, মধ্যে মধ্যে, সময় সময়, কথন কথন এরূপ হয় কেন? সকল সময় হয় না কেন? আহার বিহারাদি কর্ম্মের অত্যাচার ও ব্যতিক্রম যেদিন হয় সেইদিনই এরূপ হয়। মনে করুন, নিত্য আপনি এক সের দুধ খান; আজ আপনার ইচ্ছা হইল, দুধ সেরকে জাল দিয়া ঘন করিয়া খাইতে। ঘন দুগ্ধ গুরুপাক। খাদ্য লঘুপাকই হউক, গুরুপাকই হউক, উহা পেটে যাইবা মাত্রই, আভ্যন্তরিক যন্ত্রেরা উহাকে লইয়া ক্রিয়া করিয়া থাকে। সেই ক্রিয়াতে খাদ্য দ্রব্যের ঘোর পরিবর্ত্তন ঘটে—খানিকটা জল হয়, খানিকটা রক্ত মাংশের পোষকতা করে; ঐ খাদ্যের রং, আকার, ওজন, সকলেরই পরিবর্ত্তন ঘটে। যাহা হউক ঐ খাদ্যের পরিবর্ত্তন কালে বাস্প সৃজিত হয়। বাস্প সৃজিত হইবারই কথা, কারণ যন্ত্রেরা সকল সময়েই ক্রিয়াবান, গতিশীল, ঘড়ির কলের মত নরিতেছে চরিতেছে; দ্বিতীয়তঃ যন্ত্রেরা একে অন্যের গা ঘেঁষিয়া আছে, দুই ক্রিয়াশীল যন্ত্র পরস্পর ঘর্ষিত হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত গতি ও ঘর্ষণে উত্তাপ সৃজিত হইতেছে। গতি ও ঘর্ষণে কেন উত্তাপ সৃজিত হয়, তাহা বুঝাইবার দরকার নাই, কারণ এক দৌড় দৌড়াইয়া আসিলে, আপনি গরম বোধ করিবেন, হাতে হাতে ঘর্ষণ করিয়া দুই হাত পৃথক করিয়া শরীরে লাগাইলে বুঝিবেন, দুই হাত হইতেই গরম ছাড়িতেছে। অভ্যন্তরিক উত্তাপের ভিতর খাদ্য পতিত হইলে, উহা আংশিক পরিবর্ত্তিত হইয়া বাস্প সৃজন করে, ইহা হয় ত বুঝাইতে পারিলাম। নতুবা আর একটি উদাহরণ দিয়া

বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। উনুনের উত্তাপের উপর এক কড়াই বেগুন চড়ান। পূর্ব্বোলিখিত পরিবর্ত্তন ও বাষ্প সৃজন, তাহা হইলে, দেখিতে পাইবেন। বেগুন হইতে জল বাহির হইতেছে, বেগুন ক্রমশঃ কাল হইতেছে, স্থান ব্যাপকতা কমিয়া গিয়া অল্প হইয়া দাঁড়াইতেছে; আর বাষ্প ধূমার মত হইয়া বেগুন হইতে উঠিতেছে। সে যাহা হউক, ছাড়াইয়া যাওয়াই বাষ্পের কাজ, যে দিকে ফাঁক পাইবে, সেই দিক দিয়াই বাষ্প পথ লইবে। যদি পথে কোন বাধা পায়, তবে যে পদার্থটী বাষ্পের গন্তব্য পথে বাধা দিতেছে, তাহাতে পুনঃপুন বাষ্প ধাক্কা দিয়া থাকে, উপরের বাষ্প ধাক্কা দিল, আবার নীচের বাষ্প উপরে উঠিয়া পূর্ব্বোক্ত বাষ্পের সঙ্গে মিশিয়া আরও জোড়ে ধাক্কা দিল, এইরূপে ধাক্কাধাক্কি বাড়িয়া যাইতে লাগিল। বাষ্প সৃজনের কারণ কমিতে আরম্ভ হইলে, ক্রমে বাষ্পও কমিয়া যায়। খাদ্যের লঘু গুরুভেদে বাষ্পের গতি, পরিমাণ, গাঢ়তা (density) ও শক্তির কমি বেশী হইয়া থাকে। আপনার দুগ্ধ খাওয়াতে যে শ্রেণীর বাষ্প সৃজিত হইয়াছিল, আজ ঘন দুগ্ধ খাওয়ায় তাহা অপেক্ষা কঠিন বাষ্প সৃজিত হইয়াছে। বাষ্পের সহজ কঠিন বুঝা দরকার। রান্না ঘরের ধূমা বাহির হওয়ার চোঙ্গা দিয়া যে ধূমা বাহির হয়, তাহাতে হাত দিলে শুধু উত্তাপ লাগিবে, আর ইঞ্জিনের চোঙ্গের উপর হাত ধরিলে হাতখানি উড়িয়া যাইবে। লঘুপাক খাদ্যের বাষ্প সহজ বা সহ্যযোগ্য হয়, আর গুরুপাক খাদ্যের বাষ্প কঠিন বা শরীরে পীড়াদায়ক হয়। দুই ইঞ্চি বেড়ের তিন হাত একখানি সোলার লাঠি, আর ঐ মাপের একখানি লোহার লাঠি দিয়া, ধাক্কা কিম্বা আঘাত করিলে, শরীরে কষ্টের যেরূপ তারতম্য হয়, লঘুপাক ও গুরুপাক

খাদ্যের বাষ্পের আঘাতেরও সেইরূপ প্রভেদ। যেদিন আপনি গুরুপাক খাদ্য খাইলেন, কিম্বা দৈনিক নিয়মের অপব্যবহার করিলেন, কিম্বা বেশী প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন ঘটিল অর্থাৎ গরম কিম্বা ঠাণ্ডা বেশী হইল, সেইদিনই, কঠিন বাষ্প স্ফুর্জ্জিত হইয়া, আপনার বুকের, উরুর ও চোখের স্থানিক মলে ধাক্কা কিম্বা আঘাত করিতে লাগিল। তাহাতে সময় সময় আপনার নির্দ্দিষ্ট ব্যাধি দেখা দিয়া থাকে। উপবাসে ব্যাধির কারণ যে সঞ্চিত মল, তাহার পরিপাক বা লোপ হয়, অর্থাৎ ব্যাধি কমে, ইহা দেখাইতে গিয়া, খানিকটা অবান্তর বিষয়ের প্রসঙ্গ করিতে হইল, পাঠক! ক্ষমা করিবেন।

রোগযুক্ত ব্যক্তির ক্রমান্বয়ে কিম্বা মধ্যে মধ্যে উপবাস দেওয়া অবশ্য-কর্ত্তব্য কার্য্য। যাহার শরীরে ব্যাধি-মল অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হইয়াছে, তাহাকে ২।৩টা কি ৩।৪টা উপবাস এক সঙ্গে দেওয়ান যাইতে পারে। উপবাসের প্রথম ও দ্বিতীয় দিনে কষ্টবোধ হইতে পারে, কিন্তু ৩য় ও ৪র্থ দিনে শরীর পাতলা ও আরাম বোধ হইবে। উপবাসের কয়েক দিন কোন কাজ না করিয়া রৌদ্র বাতাস উপভোগ করিতে হয়। লোকে উপবাসের প্রথম দিনের কষ্ট দেখিয়া মনে ধারণা করে, আরও ২।১টা উপবাস দিলে হয়ত মরিয়া যাইব। কিন্তু এটা ভ্রান্তবিশ্বাস। দুঃখই সুখের জনক; কষ্ট সহ্য করিলে তবে সুখভোগ কপালে ঘটে, এই-ই জগতের নিয়ম। আগে কঠিন জ্বরাদি রোগে মাসাবধি পর্য্যন্ত কবিরাজ মহাশয়েরা রোগীকে অনাহারে রাখিতেন। তাহারা এমন সারিয়া উঠিত যে, দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত আর অসুখের মুখ দেখিত না। এখন রোগীকে আদর করিয়া অনেক রকম মুখরোচক খাদ্য দেওয়া হয়। ইহার ফলে, সে রোগটা

শীঘ্র সারে বটে, কিন্তু আজীবন বারে বারে ব্যারামে পড়িতে হয় ও অল্প বয়সে ভব-লীলার শেষ হয়। মানুষে সাধারণভাবে দিনযাপন করিয়া যে সামান্য অত্যাচার করে, তাহারই সংশোধনের জন্য শাস্ত্রবেত্তরা বার্ষিক কতগুলি উপবাসের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। আর আমরা জ্ঞানতঃ অজ্ঞানতঃ কত অত্যাচার না করিতেছি। যে সকল ব্যক্তি বার মেসে রোগী, যেমন কেহ যক্ষ্মাগ্রস্ত, কি হাঁপানি, কি অর্শে কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহাদিগের পাঁজিতে যতগুলি উপবাসের কথা আছে, তাহার একটিও বাদ দেওয়া উচিত নয়। যাহারা মধ্যে মধ্যে ব্যারামে পড়ে, তাদেরও 'পাগলার চৌদ্দ পাগলীর আট' প্রভৃতি মোটামুটিগুলি করিতে হইবে। ইহাতে শাস্ত্রীয় ধর্ম্ম ও শারীর ধর্ম্ম উভয়ই পালন করা হইবে।

উপবাসের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থিত হইতে পারে, তজ্জন্য আরও কিছু লিখিতে বাধ্য হইলাম। একজন প্রশ্ন করিলেন, ঘড়িতে রোজ দম না দিলে, ঘড়ি বন্ধ হইয়া যাইবে যে। বিনীতের উত্তর— প্রথমতঃ মানুষ ও ঘড়ি এক জিনিষ নহে, দ্বিতীয়তঃ ঘড়িতে দম দেওয়ার উদ্দেশ্য ঘড়ির চলিবার শক্তি করিয়া দেওয়া, কোন ঘড়িতে রোজ দম দিয়া, কোন ঘড়িতে ৭ দিন পর দম দিয়া, এ উদ্দেশ্য সাধন করা হয়, মনুষ্য-ঘড়িতে কতক্ষণ বা কত দিন পরে দম দিতে হয়, তাহা তলাইয়া ভাবিয়া উত্তর দিবার বিষয়, মনুষ্য-ঘড়িরও ব্যক্তিগত হিসাবে দমের সময়ভেদ করা যাইতে পারে, কারণ সকলের স্প্রিং সমান নহে। দম দেওয়া আর আহার দেওয়া একই কথা, তাহা বিচক্ষণ পাঠক এতক্ষণ বুঝিয়া থাকিবেন। দম পাইলে ঘড়ির কলগুলি চলিতে থাকে, তাহাতেই ঘড়ির সময় রাখা কার্য্য সাধিত হয়; মানুষ আহার করিলেই তাহার শারীরিক

ক্রিয়া হইয়া থাকে, তজ্জন্যই সে সকল কর্ম্ম করিতে সমর্থ হয়। পীড়িত মানুষের শরীরে ব্যাধি-মল থাকে, পূর্ব্বে তাহা আপনাদিগকে বলিয়াছি। আজ আমি কিছু খাইলাম না, তাই বলিয়া আমার শারীরিক ক্রিয়া বন্ধ থাকিবে না, যন্ত্র সকল নিষ্ক্রিয় রহিবে না। তবে তাহারা কি নিয়া কাজ করিবে? আমার শরীরে যে ব্যাধি-মল আছে, তাহা লইয়া যন্ত্রেরা কাজ করিবে, অন্য দিন দৈনিক আহারীয় লইয়া কার্য্য করিত, ব্যাধি-মল লইয়া কার্য্য করিবার সময় পাইত না, আজ আহারীয় লইয়া কার্য্য করিতে হইতেছে না বলিয়া ব্যাধি-মল লইয়া কার্য্য করিতেছে। বেড়া ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় আপনার ক্ষেতে গরু আসিয়া ক্ষতি করিতেছে, পত্র লিখিবার সময় পাইতেছেন না, আপনার আত্মীয় স্বজন রাগ করিতেছেন, আজ আপনার কাছারী নাই, নিয়মিত কাজ নাই, আজ এই সকল কর্ত্তব্য সমাধান করিতেছেন। এইরূপ বকেয়া কাজ সারার ন্যায় ব্যাধি-মলের ক্রিয়া হইতেছে। আপনি ১০টার সময় খান, উপবাসের দিন যেমনই ১০টা বাজিল, অমনই ক্ষুধার উদ্রেক হইবে, কিছুক্ষণ পর ক্ষুধা পড়িয়া যাইবে। ক্ষুধার উদ্রেক হইল কেন এবং ক্ষুধা চলিয়া গেল কেন, তাহাও বুঝিবার বিষয়। আপনার পূর্ব্ব দিনের আহারীয় পর দিন, অন্য দিনের মত, ১০টার মধ্যে পরিপাক হইয়া যথাস্থানে চলিয়া গেল ও ক্ষুধাকোষ খালি পড়িল, তাই ক্ষুধা দেখা দিল। ক্ষুধাকোষ কিছুক্ষণ খালি থাকার পর, শরীরের অন্যান্য স্থানের আবদ্ধ মল ঐ কোষে আসাতে আবার ক্ষুধার নিবৃত্তি হইল। এই নিবৃত্তির নামই 'পিত্তিপড়া।' পিত্তিপড়ার ভয়ে লোক সকালে উঠিয়া 'চাল-জল' করে। আবদ্ধ মল শরীরের মধ্যে এমন কঠিন হইয়া থাকে যে, উহাকে তরল করিয়া পাক-

যন্ত্রের মধ্যে আনিতে শরীরকে বেগ পাইতে হয়। মলের কাঠিন্য ও শরীরের শক্তির অনুপাতে শরীরের ভিতর একটা তোলপাড় হয়। এই তোলপাড়েই আপনি উপবাসের প্রথম প্রথম কেমন একটা কষ্ট বোধ করেন। তারপর মলাংশ পাকস্থলীতে চলিয়া আসিলে ও বাহ্য প্রস্রাব ঘর্ম্ম হইয়া শরীর হইতে নির্গত হইয়া গেলে, উপবাসের আরাম উপভোগ করিবেন। উপবাসের পর ঘন লাল প্রস্রাব হইবে, কারণ ঐ প্রস্রাব মলবাহী। তলপেটে, পায়ের হউক, মাথার হউক, সকল স্থানের মল আপনি চলিয়া আসে। নদীর ধারা যেমন সকল দিক হইতে বহিয়া সাগরে আসিয়া পড়ে, তেমনি ভালমন্দ শরীরে প্রবিষ্ট পদার্থ তলপেটে জমা হয়, আবার তথা হইতে শরীরের বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্নরূপে চলিয়া যায়। শেষ কথা, উপবাস-চিকিৎসা (fast-cure) অর্থাৎ বিনা ঔষধে ও বিনা অস্ত্রে শুধু উপবাস করাইয়া সকল রোগ আরোগ্য করিবার প্রথা বিলাতে প্রচলিত হইয়াছে। "সিনক্লেয়ার ক্রমান্বয়ে ১২দিন উপবাস করিয়া কিরূপ ছিলেন, দেখুন। প্রথম দিন ভয়ঙ্কর ক্ষুধা বোধ হইল। দ্বিতীয় দিন প্রাতেও কিছু ক্ষুধা বোধ হইল, কিন্তু তাহার পরে আর ক্ষুধাবোধ হয় নাই। ইতিপূর্ব্বে এক সপ্তাহ ধরিয়া তাঁহার মাথা ধরিয়া ছিল। দ্বিতীয় দিনেই তাহা অদৃশ্য হইল। তৃতীয় ও চতুর্থ দিনে একটা দুর্ব্বলতা ও জড়তার ভাব দেখা দিল বটে, কিন্তু মনটা যেন খুব পরিষ্কার ও সতেজ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। পঞ্চম দিনের পর তাঁহার অনেকটা সবল বোধ হইল। সেদিন বেশ বেড়াইয়া আসিলেন ও অনেকটা লিখিয়া ফেলিলেন। দ্বাদশ দিনের পর উপবাস ভঙ্গ করিলেন। সেইদিন জীবনে যেন সর্ব্বপ্রথম তিনি সম্পূর্ণ সুস্থবোধ করিলেন। মনের শক্তিও যেমন তীক্ষ্ণ বোধ হইতে লাগিল, শারীরিক শ্রমের জন্যও সেইরূপ একটা প্রবল ইচ্ছা জন্মিতে লাগিল। সিনক্লেয়ার বলেন উপবাসে অনন্ত যৌবন লাভ করা যায়।" (ভারতী।)

(খ) পরিশিষ্টে খাদ্যাখাদ্যের প্রবন্ধে সুস্থ ও অসুস্থ লোকের পথ্যাপথ্য মিশিত করিয়া লিখিত হইয়াছে, এক্ষণে শুধু রোগীর পথ্যাপথ্য লিখিত হইতেছে। জগতে কোন পদার্থই নিষ্ক্রিয় থাকে না। কেহ বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, কেহ বা ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে। পীড়িত লোকের ব্যাধি-মলেরও ঐ দশা হইতেছে। যখন, পীড়া হইবার পূর্ব্বে, লোকে পীড়ার সম্বন্ধে কিছুই বুঝিতে পারে না, তখনই ব্যাধি-মল বাড়িয়া যাইতে থাকে; আর যখন পীড়া দেখা দেয়, তখনই ব্যাধি-মল ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে। জ্বরের বিষয়ে ইহার প্রসঙ্গ করা যাইবে।

যাহার দেহে ব্যাধি-মল বেশী, তাহার দেহে পীড়া পরিস্ফুট হইয়া পড়িলে ক্রিয়া বেশী হয়; শরীরের ক্রিয়া করিবার যতখানি ক্ষমতা আছে, সেই ক্ষমতাটুকু তাহার ব্যাধি-কালে নিযুক্ত থাকে; তাহার উপর, কতকগুলি খাদ্য বস্তু শরীরে প্রবেশ করাইলে, তাহা লইয়া ক্রিয়া করিবার ক্ষমতা, উক্ত শরীরে অভাব হয়। এই অভাবের জন্য, খাদ্যবস্তুর সদ্ব্যবহার হয় না। সেইজন্য পীড়া বৃদ্ধিকালে না খাওয়াই ব্যবস্থা। পীড়া যে সময়ে কম থাকে, কিম্বা অল্প অসুখে, রোগীর পরিমাণে অল্প ও লঘুপাক খাদ্য খাওয়া উচিত। ব্যারাম সময়ে, পাক-করা জলীয় খাদ্য, আমরা অনুমোদন করি না। ঐ সময়, প্রত্যেক বেলায় ২।১টি করিয়া পেয়ারা, ২।১ কুচি পেঁপে ইত্যাদি কাঁচা ফল, কিম্বা এক আধ মুঠ করিয়া বুট মটর আদি শস্য, কিম্বা নরম ও কচি পাতা খাইতে উপদেশ দেই। কাঁচা ফল তীক্ষ্ণ বীর্য্যশালী, তজ্জন্য সামান্য মাত্রায় খাইতে হয়, কাঁচা ফল খাইতে যদি ইচ্ছা না হয়, তবে অর্দ্ধ পক্ক ফল খাইবেন, সুপক্ক কিম্বা অতি পক্ক ফল গুরুপাক। মুগ, মটর প্রভৃতি শস্যগুলি, জলে ভিজাইয়া

নরম করিয়া না লইয়া, এমনই অপরিষ্কার ঝাড়িয়া চিবাইয়া খাওয়া যাইতে পারে। চর্ব্বণ করায় হজমের বিশেষ আনুকূল্য হয়। যাহাদের দাঁত নাই, তাহারাও যেন ঐ সকল জিনিষ গুঁড়া করিয়া মাড়ি নাড়িয়া খান। পশুদের চিবাইয়া খাওয়া অভ্যাস আছে, তাহার উপর তাহারা জাবর কাটে। ধীরে ধীরে চিবাইয়া খাইলেই, খাদ্য আপনি উদরে প্রবিষ্ট হয়, গিলিতে হয় না। জিনিষ আধ-চেবা করিয়া গিলিয়া খাইলে, চিবাইয়া গুঁড়া করিবে কে? পেটের ভিতর যে সকল যন্ত্র আছে, তাহাদের কি দাঁত আছে, যে তাহারা চিবাইয়া গুঁড়া করিয়া দিবে। বুট, মটর বিস্বাদ খাদ্য নহে, উপরন্তু একটু বেশ সুঘ্রাণ আছে। কাঁচা তরকারীও খাওয়া যাইতে পারে। কাঁচা বেগুন, কি পটোল, কি লাউ কুমরা, এ সকলে তৃষ্ণা নিবারণ করে, খাইতেও যতখানি কষ্টকর মনে করা যায়, তাহার এক শতাংশ কষ্টকর নহে। কাঁচা তুলসীর পাতা কত সুঘ্রাণ। সময়ে তিক্ত খাইতে ইচ্ছা করে, তখন কচি লতির ডোগা চিবাইতে পারেন। ব্যাধিত ব্যক্তির তিক্ত বড় মিষ্ট বোধ হয়। এ সকল পথ্য এককালীন উদর পূরিয়া খাইবেন না। সামান্য সামান্য মাত্রায় ২ ৪ ঘণ্টা পর পর খাইবেন। পৃথিবীতে অপরাপর প্রাণীর জলই এক মাত্র পানীয়, মনুষ্যেরও তাহাই হওয়া উচিত। যখনই তৃষ্ণা পাইবে, তৃষ্ণা মিটে এই পরিমাণ, ঠাণ্ডা ও কাঁচা জল খাইবেন।

ফল-তরকারী যাহাই বলুন না সকলেরই ভাল মন্দ আছে। মৎস্য-মাংশত্যাগীরা নিরামিষ আহারী বলিয়া স্পর্দ্ধা করেন! কিন্তু ফল-তরকারীর মধ্যেও আমিষ নিরামিষ আছে। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়িতারা এ তত্ত্ব সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ব্যবস্থায়

অনেক ফল-তরকারী, এইজন্য খাওয়া নিষিদ্ধ আছে। সারদার উদ্যানের অমৃত ফল আধুনিক রসায়ণ শাস্ত্র (chemistry), এই পাশ্চাত্য রসায়ণ আয়ত্ত করিলে, আমাদের মহদোপকার সাধিত হইতে পারে। রাসায়ণিক বিশ্লেষণ করিলে মাংশের ভিতর যে আপত্তিজনক পদার্থ (Objectionable ingredient) পাওয়া যায়, ফল-তরকারীতেও তাহা পাওয়া গিয়া থাকে। ইহা হইতে দেখিতে পাইলেন, আমিষ ত্যাগ করিয়া নিরামিষাশী হইলেও রক্ষা নাই, ফল-তরকারীও বাছবিছ করিয়া খাইতে হয়। রোগীর আহার যত সাত্বিক ভাবের হয়, ততই ভাল।

সাগু পথ্যটা কতকটা ভাল। বার্লি, এরারুট ভাল নহে, কারণ ইহাতে অন্য গুঁড়া ভেজাল চলিতে পারে। টিনে করা, বিদেশ আমদানী বার্লি প্রভৃতি রোদ বাতাসও পায় না, আর দিন গিয়া 'বাসি' হয়, তার উপর, খারাপ টিন হইলে, টিনের একটা ধাতব দোষ, ঐ সকল খাদ্যে প্রবিষ্ট হয়। বিস্কুটও ভাজা জিনিষ, উপরন্তু পূর্ব্বোক্ত দোষগুলি হয়। পূর্ব্বে খইয়ের মণ্ড দেওয়া হইত, তাহারও কতকটা অনুমোদন করা যায়। কিস্‌মিস্‌, সেও, নাসপাতি প্রভৃতি দেশজাত পেয়ারা, আনারস প্রভৃতির তুলনায় মন্দের ভাল। সোডা, লেমনেড ছেলেভুলান ও ঔষধ মিশ্রিত পানীয়, ইহার কি করিয়া অনুমোদন করি? গরম জল সোঁদাগন্ধযুক্ত ও গুরুপাক।

আহারের পর ঘুমাইলে, পরিপাকে দোষ ঘটে। বুক পেট খাড়া থাকিলে, যাহা খাওয়া যায়, তাহা আপনিই ভারত্ব প্রভাবে উদরে নামিয়া যায়, এইজন্য খাওয়ার পর হাঁটু গাড়িয়া রাজাসনে বসার নিয়ম এখনও কেহ কেহ করেন। শুইলে পূর্ব্বোক্ত মাধ্যাকর্ষণের উপকারিতা পাওয়া

যায় না। যদি শোয়া যায়, চিত হইয়া শোয়া উচিত, পাশ ও উপুর হইয়া শুইলে, যন্ত্রেরা চাপ পায়। এইজন্য ছড়া আছে—

খেয়ে চিত, না খেয়ে কাত। উপুর হয়ে কাটাই রাত॥

খাওয়ার পর শোয়াতে হজমের যে বিশেষ দোষ ঘটে, তাহা আরও একটু প্রণিধান করিয়া শুনুন। জাগরণে শরীরের যে শক্তি ক্রিয়া করে, নিদ্রায় তাহার বিপরীত শক্তি ক্রিয়া করিয়া থাকে। জোয়ারের ও ভাটার শক্তির প্রভেদের ন্যায় নিদ্রা জাগরণের শক্তির প্রভেদ। জাগরণ কালে, খাদ্যাদি যাহা বাহির হইতে শরীরে প্রবিষ্ট হয়, তাহারই পাচন ক্রিয়া হয়; নিদ্রাকালে শরীরস্থ অপ্রয়োজনীয় মল বাহিরে আসে, যথা—লালা পেঁচটি প্রভৃতি। জাগরণের অন্তর্গতি, নিদ্রায় বহির্গতি। গতিকেই খাইয়া ঘুমাইলে বহির্গতি প্রবল হইয়া উঠে, অন্তর্গতি কম কিম্বা স্থগিত হয়, ভক্ষিত খাদ্য ধীরে ধীরে পাক হয় কিম্বা যেমন তেমনি থাকে। বেশী জলীয় খাদ্য খাইলে খাওয়ার পর ঘুম আসে। এ নিদ্রা স্বাভাবিক নহে, ব্যাধির নিদ্রা।

সহরবাস রোগীর পক্ষে যুক্তিযুক্ত নয়। যেমনই শরীর খারাপ বোধ হইতে লাগিল, অমনই রোগীকে পল্লীগ্রামে আত্মীয়ের বাড়ি চলিয়া যাইতে হয়। রোগের প্রথম প্রথম রোগীরও সামর্থ থাকে, আত্মীয়ের সেবা শুশ্রূষার বেগও পাইতে হয় না। সহরবাসের আগা গোঁড়া দোষ, রোদ বাতাস রীতিমত খেলে না, ড্রেণ ও আবর্জ্জনার গন্ধ, গাড়ি ঘোড়ার শব্দ ও মানুষের কোলাহল, ইত্যাদি। 'সহরের কলের জল, পল্লীগ্রামের নদী পুকুর কুঁয়ার জল হইতে ভাল কিসের? কলের জল, সহরের নদ্যাদির চেয়ে ভাল এই মাত্র, কারণ এই সকল নদ্যাদিতে সহ-

রের ক্লেদ মাটি চুয়াইয়া পড়ে ও লোকে তাহাতে আবিল দোষ। কলের জল রোদ বাতাস বিহীন stockএ ও পাইপে থাকে; দ্বিতীয়তঃ, ধাতু নির্ম্মিত reservoirএ থাকে, তাহাতে রোদে-ছাতা reservoirএ ও জলে chemical action হইয়া জল দূষিত হয় কি না, তাহাও বিবেচ্য বিষয়।

নাচার হইলেই nature. যখন রোগী নাচার হয়, ডাক্তার নাচার হয়, ঔষধ নাচার হয়, তখনিই nature. যখন ঔষধে ডাক্তারে অসুখ ভাল করিতে পারিল না, তখনই তাহাকে বিনা ঔষধে natureএর উপর ফেলিয়া রাখা হইল। কিম্বা প্রকৃতির লীলাভূমিতে স্থান পরিবর্ত্তন করিবার জন্য পাঠান হইল। যখন ঔষধে, চিকিৎসকে অপারগ, তখন প্রকৃতি পারগা হইলেন, অর্থাৎ প্রকৃতি অসুখ কঠিন হইলে পারগা হইলেন। যিনি কঠিন সারাইতে পারেন, তিনি সহজ সারাইতে কি পারেন না? যে দশ মাইল হাঁটিতে পারে? সে কি দুমাইল হাঁটিতে পারে না? তাই বলি, প্রথম হইতেই জননী প্রকৃতির শ্রীচরণে আত্ম-সমর্পণ করুন, তিনি মা, তাঁহার অবশ্যই কৃপা হইবে। রোদ হইল, জল হইল, ঠাণ্ডা পড়িল, কেবলই ঢাকো, ঢাকো, আত্মগোপন। এ কি ভাল? হাজির পেয়াদার শুনাগর নাই, যেমনই অসুখ হইবে প্রকৃতি সমাগম করুন, রোগ অবশ্যই আরোগ্য হইবে। পল্লীগ্রামবাসের উপকারিতা সম্বন্ধে দুইটি অংশ উদ্ধৃত (বঙ্গবাসী।) করিয়া দিলাম।

"লণ্ডন সহরে টমাস্ পার নামক এক সাহেবের মৃত্যু হইয়াছিল এক শত ছিপ্পান্ন বৎসর বয়সে। লণ্ডনে ইহার বাস নহে,—বাস ছিল মফস্বলে। অধিকাংশ বয়স পার সাহেব মফস্বলেই কাটাইয়াছিল। মোটা রুটি প্রভৃতিই ইহার খাদ্য ছিল। কিন্তু লণ্ডনে আসিয়া পার সাহেব

প্রলোভনে পড়িয়া মদ ধরিল, কেবল মদ নহে—অন্যান্য আহার্য্যেও বিলাসিতা বাড়িল। ফলে আয়ুক্ষয় হইল অনতিবিলম্বে। তদানিন্তন সম্রাটের আদেশে একজন বড় ডাক্তার পার সাহেবের শব-ব্যবচ্ছেদে,—পাকস্থালী পরীক্ষায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই ডাক্তার সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন,—সহরের অবিশুদ্ধ জল বায়ু এবং আহার্য্য পরিবর্ত্তনই পার সাহেবের স্বাস্থ্য ভঙ্গের প্রধান কারণ।"

"স্পেন রাজধানী মাদরিদের নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে আজ আট বৎসর কাল কাহারও মৃত্যু ঘটে নাই। সংবাদ সুখের বটে,—কিন্তু গিরজার পাদরির পক্ষে কতকটা দুঃখের; তাঁহার আয় কমিয়াছে; তাঁহাকে অন্য কর্ম্ম লইতে হইয়াছে; কবর-খনকগণ বাগানের কার্য্যে লাগিয়া গিয়াছে; কবরভূমিতে তরকারীর বাগান বসিয়াছে!"

ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি, যে কাজ করিয়া দিনপাত করেন, তাহা হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হইবে, বিম্বা শরীরে কষ্ট বোধ না হয়, এতটুকু কাজ করিতে পারেন। মানসিক কার্য্য, চিন্তা কি অধ্যয়ন, যত না করিতে পারা যায়, ততই ভাল। শারীরিক কার্য্যের মধ্য, নিজের দৈনিক কাজ নিজে করিতে পারিলেই ভাল, অন্য কাজ এক আধটুক ধীরে ধীরে সমাপন করিবেন।

জিম্নাসটিকটা কিছু পুরাণ পড়িয়া গিয়াছে। ব্যাটবল, ফুটবল, ট্যাণ্ডো প্রভৃতির আদর চলিতেছে। এই সকল ব্যায়ামে জগতের কতটা পরিশ্রম বৃথা যাইতেছে, তাহা ভাবিবার কথা। ঘর-গৃহস্থালীর কাজ, বাগানের কাজ, এই সকল করিলে পরিশ্রমও হয়, সংসারের উপকারও হয়। যাঁহারা ব্যায়াম করে, আর যাহারা জগতের কাজ করে, তাহাদের শারীরিক বলের পার্থক্য বড় কম বেশী নহে। ব্যায়ামীদের ব্যায়াম না করিলেই শরীর অসুখ করে, আর ব্যায়ামীদের অসুখ হইলে কঠিন অসুখ

হয়, ব্যায়ামীরা অল্পজীবীও হয়। ফুটবল, ব্যাটবলে নির্দ্দিষ্ট অঙ্গ অনবরত চালিত হয়, ইহাতে বৈজ্ঞানিক দোষ ঘটে। ব্যায়াম করার উদ্দেশ্য সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমভাবে চালিত হওয়া, বিশেষ যে অঙ্গ দুর্ব্বল ও ক্ষীণ তাহাই অধিক চলিত হইয়া অন্য স্বাভাবিক অঙ্গের সমান হওয়া। আপনার হাত অপেক্ষা পা সবল, আপনার উচিত হাত দুটিকে পার সমান করিয়া লওয়া, কিন্তু আপনি ফুটবলী হইলেন, কেবলই পার চালনা করিতে লাগিলেন, তাহাতে আপনার দুই পা আরও সবল হইল, বাঁ পা উপেক্ষিত হইয়া পড়িয়া রহিল। দ্বিতীয় কথা, তাড়াতাড় ও অধিক বল প্রয়োগ করিয়া ব্যায়াম করিলে, সে ব্যায়াম স্থায়ী হয় না। আপনার ডান হাতখানাকে যদি এক ঘণ্টায় হাঁটুর কাছ হইতে তুলিয়া ঊর্দ্ধ বাহুর মত করিতে পারেন, আর সেই তোলায় সামাঞ্জস্য মাত্রায় মাত্রায় ঠিক থাকে অর্থাৎ তোলার গতি বেশী কম না হইয়া সমান হয়, তবেই আপনার ব্যায়ামের চরম হইল। সাধ্যমত ধীরে ধীরে ব্যায়াম করাই, আমাদের অভিমত। সকল রকম সাংসারিক কাজ করিলে নানান রকমে অঙ্গের চালনা হয় এবং জগতের অনেক শিল্পও শেখা হয়, বাগানের কাজে উদ্ভিদের সহবাসে শরীর সুস্থ থাকে ও আয়ু বৃদ্ধি হয়। হাটবাজার করা, আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা করা, এ সকলেও ভ্রমণের পরিশ্রম হয়। ভ্রমণ ধীরে ধীরে ও পায়ে সয় এইরূপ করা উচিত। বিলাতের হটন সাহেব ১২ ক্রোশ দৈনিক হাঁটিতেন। আমাদের ভ্রমণেও উদ্দেশ্য থাকিত, আগে কেহ কেহ ১২ ক্রোশ হাঁটিয়া নিত্য প্রাতর্গঙ্গা স্নান করিত। খালি পায় হাঁটিলে ও লোকালয় অপেক্ষা বনপথ ও নদীর ধারে হাঁটিলে ভাল হয়। আমাদের তীর্থ ভ্রমণও সুন্দর ব্যায়াম।

রাত্রে কেরোসিন ব্যতীত অন্য তেলের আলো ব্যবহার করা উচিত। কুপিতে কেরোসিনের ধূমা ও গন্ধ, চিমনির কাঁচের প্রধান দোষ, চোখের জ্যোতি নষ্ট করা। আলো প্রতিভাত (reflected) হইয়া আসিলেই দোষের হয়। শাস্ত্রে চন্দ্রের দিকে তাকান নিষেধ আছে, চন্দ্র প্রতিভাত পদার্থ (reflected body), চন্দ্রের নিজের কোন আলোক নাই, সূর্য্যের জ্যোতি চন্দ্রে পড়ায় চন্দ্র উজ্জ্বল দেখায়। চিমনির আলোতে পড়ায় ছেলেদের চোখের এত দুর্দ্দশা, ছেলেদের এখন পড়িতে এত উজ্জ্বল আলো লাগে যে, তেলের আলোকে তাহারা ভাল দেখিতে পায় না।

রাত্রের আহার কম করিতে হয় এবং আহারের পর অপেক্ষা করিয়া শুইতে হয় ; তাহা হইলে সকালে উঠা যায় ও পরদিন কাজ কর্ম্ম করিতে কষ্ট বোধ হয় না। রাত্রে ঘরে যেন আলো না থাকে এবং ঘরের জানালা দোর যেন কিছু বা সম্পূর্ণ খোলা রাখা হয়। ঘুমের সময়, শরীরস্থ দূষিত বায়ু নিশ্বাসের সঙ্গে বাহির হয়, দোর খোলা থাকিলে উহা বাহিরে চলিয়া যায়, দোর বন্ধ থাকিলে শ্বাসের সহিত আবার শরীরে প্রবেশ করে। যাহার শ্বাস প্রশ্বাসের যন্ত্র খারাপ, সে ঘুমের সময় হা করিয়া ঘুমায়, মুখ দিয়া শ্বাস প্রশ্বাস লইয়া থাকে। মুখ বুজিয়া ঘুমানই ঠিক। ঘুম না আসিলে, বাহিরে বেড়ান কি বসিয়া থাকা উচিত। এক রাত্রি ঘুম হইল না, পরের রাত্রিতে হইবে। ৪ মাস ঘুম না হওয়া রোগীও দেখা গিয়াছে। ক্রমান্বয়ে ঘুমায় এদেশে এখনও এমন রোগী দেখা দেয় নাই। স্বপ্নদেখা, দাঁত কড়মড় করা, নাক ডাকা, ব্যাধির লক্ষণ। প্রকৃত ঘুম হইতে উঠার পর মনে হইবে, পুনর্জ্জন্মলাভ হইল।

উপসংহার।

—:০০:—

কোন ব্যাধি কেমন করিয়া সৃজিত হয়। উহাকে উপযুক্ত সময়ে দমন না করিলে আর কি ব্যাধি হইতে পারে। কি কি উপায় অবলম্বন করিয়া রোগমুক্ত হইতে হয়। ঔষধে জগতের কতখানি অপকার করিতেছে। রোগীকে অস্ত্রাঘাত করাতে কি দোষ হইতেছে। এই পুস্তকের উত্তরভাগে এই সকল বিস্তৃতভাবে বিবৃত করিবার ইচ্ছা রহিল। উত্তর ভাগ প্রকাশ করা, না করা সম্বন্ধে মতামত বিজ্ঞাপনে দেখিবেন। যদি উত্তরভাগ প্রকাশ করিতে বিলম্ব হয়, কিম্বা প্রকাশিত না হয়, আর যদি পুস্তক পাঠ করিয়া কিম্বা পুস্তকের বিবরণ শুনিয়া কাহারও প্রাকৃতিক চিকিৎসার নিয়ম পালন করিতে ইচ্ছা করে, তিনি আমাদের সহিত পরামর্শ করিয়া চিকিৎসিত যেন হন; পুস্তকখানি অসম্পূর্ণ প্রকাশিত, ইহার প্রয়োগাদির অধ্যায় পড়িয়া কেহ যেন কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হন।

শেষ নিবেদন, আমার দেশবাসীর নিকট, যে তাঁহারা হিন্দু হউন, মুসলমান হউন, খৃষ্টান হউন, সকলে মিলিয়া দেশ প্রচলিত নিয়মের উদ্ধার করুন। কোনটিকে গোঁড়ামি, কোনটীকে মেয়েলী বলিয়া উপহাস করিবেন না। সকল নিয়মই আমাদের পূর্ব্ব পুরুষের অভিজ্ঞতা ও অধ্যবসায়ের ফলে। এক হাতে ঐ সকল নিয়ম লউন, এক হাতে আধুনিক বিজ্ঞানরূপ কষ্টি পাথর লউন; কষিয়া কাহার কি মূল্য নিরূপিত করুন। পরের জিনিষ হাজার ভাল হোক, আমাদের বংশানুক্রমিক অভ্যাসের ফলে, তাহা আমাদের নিজের জিনিষের মত পুষ্ট কখনই হইতে পারে না। আমাদের মধ্যে যাঁহারা কৃতবিদ্য আছেন, তাহারা পাশ্চাত্য শাস্ত্রের অনুশীলনেই আছেন। পাশ্চাত্যেরা ও আমরা যদি একই শাস্ত্রের অনুশীলন করিব, তবে আমাদের শাস্ত্রের অনুশীলন করিবে কে? কেন হিন্দু রসায়ণের কি উদ্ধারসাধন হয় নাই? সকলে একযোগে, এক একটির উদ্ধার করা যাউক।

পরিশিষ্ট (ক।)

প্রয়োগ।

———:০:———

মৃত্তিকা।

বালুকাবিহীন মৃত্তিকা জলে গুলিয়া, আপাদমস্তক মাখিয়া, বসিয়া, শরীরে শুখাইতে হইবে ; তারপর, গামছা দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া, জল দ্বারা শরীর পরিস্কার করিতে হইবে। ১

এইরূপ করিলে, লোমকূপ পরিস্কার হয়, ঘর্ম্ম সহজে নির্গত হইতে পারে, ২য়তঃ, শরীর স্নিগ্ধ হয়। ৩য়তঃ, মৃত্তিকার বিশেষ ক্ষমতা যে উহা শরীরের জমাট মলকে ভাঙ্গিয়া দেয়। তজ্জন্য সাধারণ রোগী মাত্রেরই মৃত্তিকা লেপন ব্যবস্থা।

একটী পাত্রে বালুকাবিহীন মৃত্তিকা রাখিয়া, তাহাতে আন্দাজ-মত জল দিয়া, নখ দ্বারা নাড়িতে হইতে। এরূপ করিলে, কাদার ন্যায় পদার্থ হইবে। সদ্যঃ কাদার দ্বারাও, এ প্রয়োগ চলিতে পারে; কিন্তু অনেক সময় কাদা পাওয়া যায় না বলিয়া উপরোক্ত প্রকরণ লিখিত হইল। ঐ কাদা, রোগীর হাতের ২।২॥০ হাত লম্বা ও ॥০।৵০ হাত প্রস্থ কাপড়ে, পুলটিসের মত, পুরু করিয়া বিছাইতে হইবে। তারপর, কাপড়ের কাদাযুক্ত পার্শ্ব দক্ষিণ ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া, তল-পেট ও পাছা বেষ্টন করিয়া শরীরে লাগাইয়া দিতে হইবে। বিশেষ-রূপে আঁট রাখিবার জন্য, শুক্‌না এক টুক্‌রা কাপড়, উহার উপরে

জড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে এবং ফিতা দ্বারা বাঁধিয়া দেওয়া যাইতে পারে। এরূপ মৃত্তিকা প্রয়োগের পর, রোগীকে বসিয়া কিম্বা শুইয়া থাকিতে হয়। মৃত্তিকার পটি শুখাইলে, খুলিয়া ফেলিতে হয়; কিম্বা, ব্যবস্থা করা হইলে, পুনরায় ২।৩ বার পটি পরিবর্ত্তন করিতে হয়। এইরূপ মৃত্তিকা প্রয়োগের পর, ৮ম সংখ্যক ও ৯ম সংখ্যক জল প্রয়োগ করিতে হইবে। ২

তলপেটের ভিতর যে সকল যন্ত্র আছে, উহাদের দোষ ঘটিলেই মল জমিতে থাকে এবং তলপেটই মল জমিবার প্রধান স্থান; তজ্জন্য এ প্রয়োগ এ স্থানে ব্যবস্থিত হইয়াছে। এ প্রয়োগের পর, কোষ্ঠ শুদ্ধি এবং মলীয় স্রাব নির্গত হয়; কারণ মৃত্তিকার গুণ, মলকে জমাট ভাব হইতে ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া দেওয়া, পূর্ব্বেই এ কথার আভাস দেওয়া হইয়াছে। মাথার সঙ্গে তলপেটের সাক্ষাৎসম্বন্ধ, তজ্জন্য মাথার ব্যারামীরা, এ প্রয়োগে অনেক উপকার পান। কঠিন শয্যাগত রোগীকে এ প্রয়োগ অবাধে ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। সন্তান প্রসবের পর প্রসূতিকে এইরূপ পটি দেওয়ান হয়। তাহাতে আভ্যন্তরিক যান্ত্রিক বিশৃঙ্খলতা দূর হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণাও ক্রমশঃ কমে।

শরীরে ক্ষত থাকিলে, ক্ষতের উপর, এইরূপ মৃত্তিকার ছোট ছোট পটি দেওয়া যাইতে পারে। তাহাতে ক্ষতের অভ্যান্তরীন মলকে জল করিয়া বাহিরে নির্গত করে, অর্থাৎ রস গলে।

বালুকা।

কোষ্ঠবদ্ধের রোগীকে আধ আনা পরিমাণ বালুকা, আহারের আধ ঘণ্টা পরে ব্যবস্থা করা হয়। সমুদ্রের বালুকার উপকার বেশী, কিন্তু

তাহা সচরাচর পাওয়া যায় না বলিয়া. সাধারণ. নদীর চরের বালুকাতেই চলিতে পারে। ৩

সাধারণের ভ্রম বিশ্বাস যে বালুকা উদরস্থ হইলে, দাস্ত হইতে থাকে। যাহারা চর প্রদেশে বাস করে, তাহাদিগকে কত রকমে বালুকা উদরস্থ করিতে হয়; কিন্তু তাহাদের স্বাস্থ্য কত সুন্দর। পেটের অসুখের রোগীকেও বালুর ব্যবস্থা করা যায়।

সকালে ও সন্ধ্যায়; একটি পাত্রে, খানিকটা বালুকা লইয়া, অগ্নিতে রোগীর ঘরের এক কোণে উত্তপ্ত করা উচিত। উহাতে ঘরের দূষিত বায়ু শুদ্ধ হয়। এবং, প্রত্যক্ষতঃ, ঘরের দুর্গন্ধ নষ্ট করে। ৪

বালু নির্দ্দোষ ও দোষনাশক পদার্থ। জলের ভিতর বালু ঢালিয়া দিয়া, কয়েক ঘণ্টা পরে, উপরের জল খাওয়া যাইতে পারে। যেখানে ভাল জল মিলে না, সেখানে এরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত। ম্যালেরিয়া প্রধান দেশ প্রায়শঃই সেঁতসেঁতে, ঐ সকল স্থানে পথে বালু ছড়াইয়া দিলে, সংক্রামকতা কমিতে পারে। ইহা পরীক্ষা করা, অতি কঠিন কথা। কিন্তু ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত বাটীতে, বাটীর কর্ত্তার মন ও সাধ্য থাকিলে, ইহার পরীক্ষা আংশিক হইতে পারে।

জল।

সময়ের একটা প্রভাব আছে, ঐ প্রভাবের জন্য সূর্য্য উঠিবার কিছু পূর্ব্বে স্নান করা ব্যাধিতেরও ব্যবস্থা। অন্য সময়েও স্নান করা যায়। ব্যাধিগ্রস্থ ব্যক্তি, নাভী হইতে হাঁটু পর্যন্ত, শরীরের যে অংশ কাপড়ে ঢাকা থাকে তাহা পুরু ও খসখসে গামছা দিয়া,

ব্রহ্মরন্ধ্রটি যেন ঘর্ষণ করেন। গঙ্গার জলে কিম্বা স্রোতো জলে স্নান করা যাইতে পারে। ৫

স্নানের উদ্দেশ্য শরীর ঠাণ্ডা করা; যতক্ষণ না শরীর ঠাণ্ডা হয়, ততক্ষণ স্নান করা উচিৎ। জল অত্যন্ত ঠাণ্ডা বোধ হইলে, গরম করিয়া লওয়া যাইতে পারে। ঠাণ্ডা ও গরম জল সম্বন্ধে এই কথা যে, উভয়ই অধিক হইলে ব্যাধির কারণ হয়। জল স্পর্শ মাত্রেই যাহার শরীর ঠাণ্ডায় আরষ্ট হয়, জানিতে হইবে তাহার শরীর মলে পরিপূর্ণ।

আমাদের বিধান কর্ত্তারা মাঘ মাসে প্রাতঃস্নান, নিরোগ হইবার জন্য নির্ণয় করিয়াছেন। একে শীত কাল, তাহে সকাল বেলা, ঠাণ্ডার উপর ঠাণ্ডা। কার্য্যে পরিণত করিয়া দেখুন, জানিতে পারিবেন, এ সময় জল ত ঠাণ্ডাই নাই, বরং একটু গরম; তারপর বেলা হইলে সূর্য্যের কিরণে শরীর গরম করিতে পারেন, কিম্বা গায়ে কাপড় দিয়া গরম হইবেন; আর দেখিবেন, স্নানের পূর্ব্বে বড় শীত আসে; কিন্তু স্নাত হইয়া উঠিলে, একটী গরম ভাব সমস্ত শরীরে ছড়ায়, বেলা হইলে এভাব তত আসে না; শীতের রাত্রি বড়, রাত্র থাকিতে ঘুম ভাঙ্গে, সকালও বড়, নিত্যকৃত্য করিয়া যাউন, ভগবানের নাম, শৌচাদি, প্রাতঃস্নান, আহ্নিক, করুন, ফলে ভানুমান দেখা দিবেন। শত্রু দেখিলে, পশ্চদ্পদ হওয়া কাপুরুষের কাজ; শীতে জড়সড় হইয়া হাববাচোব্বা মুড়িয়া, ঘরের ভিতর থাকিয়া শীতকে প্রশ্রয় দিবেন না, শীতের সহিত সম্মুখ রণে প্রবৃত্ত হইবেন। ভাবিয়া দেখিলে, বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, শাস্ত্রকারদিগের লিখিত নিয়মগুলি তাঁহাদের অনেক চিন্তার ফলস্বরূপ, কার্য্যক্ষেত্রে ইহার উপকারিতার প্রমাণ পাওয়া যাইবেই।

বৃষ্টির সময়, বাহিরে বসিয়া, কিম্বা শুইয়া, সহ্যমত ধারা লওয়া দরকার। তারপর গরম কাপড়ে শরীর ঢাকিয়া রাখিতে হয়। সাধারণ রোগীর এইরূপ বৃষ্টি-স্নান ভাল। ৬

দেশে ঘামাচীর রোগীকে বৃষ্টির ধারা লইতে দেখা যায়। অনেকে বৃষ্টির জল লাগিলে, বিকার হইয়া মরিবার ভয় করেন; কিন্তু তাঁহাদের সে ভয় কাল্পনিক; কারণান্তরে বিকার হইতে পারে বটে।

বাহ্য ও প্রস্রাবের পর, মল ও প্রস্রাবের দ্বারে জল ব্যবহার অবশ্য-করণীয়। কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া জল ঢালিতে হইবে ও অঙ্গুলী দিয়া উভয় দ্বার ঘর্ষণ করিতে হইবে। ৭

বঙ্গদেশে, সভ্য সমাজে, প্রস্রাবের পর জল লওয়া, অনেকটা উঠিয়া গিয়াছে এবং 'অতি' সভ্য সমাজে, মলত্যাগের পর, কাগজ লওয়া প্রবর্ত্তিত হইতে চলিয়াছে। এসকল অতি দুঃখের কথা, কারণ জল ব্যবহারের ভিত্তি বিজ্ঞানের উপর। আমাদের পাশ্চাত্য অধ্যাপক মহাশয় কাগজ লওয়ার দোষ দর্শাইয়া, জীব জগতের অনুকরণ করিতে উপদেশ করিয়াছেন, অর্থাৎ মলত্যাগের পর কিছু ব্যবহারেরই ব্যবস্থা করেন নাই। আমাদের মতে, এরূপ ব্যবস্থার এখনও সময় হয় নাই।

৮ম ও ৯ম সংখ্যক স্নান প্রাকৃতিক চিকিৎসার মেরুদণ্ডস্বরূপ। বিশেষ ৯ম সংখ্যকটি বিজ্ঞান-জগতের অদ্ভুত অবিষ্কার, এমন কি, ইহাকে ভগবৎ প্রেরীতও বলা যাইতে পারে। অষ্টম ও নবম প্রয়োগ অন্য কোন প্রয়োগের বিনা সাহায্যে নিজে ব্যাধি নিরাময় করিতে সক্ষম।

একটী বড় গাম্লায়, এরূপ পরিমাণ জল দিতে হইবে যে, বসিলে নাভীর দুই অঙ্গুল উপর হইতে হাঁটুর উপর পর্য্যন্ত ডুবিতে পারে। জল অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা হওয়া চাই। জল প্রয়োগের সময় গাম্লায় বসিয়া প্রথমতঃ পা দুখানি কম্বল কিম্বা গরম কাপড় দিয়া মুড়িয়া দিতে হইবে। তৎপরে এক খানি মোটা খস্খসে গামছা দিয়া, জলে ডোবা অংশে ঘর্ষণ করিতে হইবে। নাভী হইতে বস্তী পর্য্যন্ত, উপর হইতে নীচে, অনেকক্ষণ ঘর্ষণ করিতে হইবে। মধ্যে মধ্যে উচু হইয়া উঠিয়া পাছা ও গুহ্য দেশে ঘর্ষণ দিতে হইবে। এরূপ প্রয়োগে ১৫।২০ মিনিট সময়ের দরকার হয়। শরীরের জলে ডোবা অংশ ছাড়া অন্য অংশে যেন জল না লাগে। ঘর নির্ব্বাত করিয়া এ প্রক্রিয়া করিতে হয়। কঠিন রোগী প্রথমতঃ গাম্লায় বসিয়া অস্থির হইতে পারে। কিন্তু জলের জীবনদায়িনী শক্তি থাকাতে, কিছুক্ষণ বসার পর, আপনি স্থৈর্য্য আসে, শরীর সবল বোধ হয়। এরূপ জল প্রয়োগের পর, রোগীকে, হয় পরিশ্রম করাইয়া, নয় রোদ্রে রাখিয়া, নয় মোটা কাপড়ে ঢাকিয়া, গরম করিতে ও ঘামাইতে হয়। কাশীর রোগীকে বুক পর্য্যন্ত জল দিয়া এ প্রয়োগ করান হয়। ৮

অনেক রোগীর এ প্রক্রিয়া করার পর, মাথা ও জ্বরের যন্ত্রণা অনেক কমে। প্রয়োগের পর, জ্বরের তাপ কোন কোন রোগীর কমিতে থাকে, কাহারও খুব বেশী জ্বর কিম্বা তাপ দেখা দেয়। শেষোক্ত লক্ষণ ভারাপ লক্ষণ, কারণ বেশী জ্বর হইয়া জ্বরটা শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়। জ্বরে জল ব্যবহার, আমাদের দেশের পূর্ব্বকর্ত্তারা করিতেন। ঘরে দরজা দিয়া

পিঁড়িতে বসাইয়া, গরম জলে শরীর ধুইয়া ও ঘসিয়া দিয়া, গা মুছিয়া, কাপড় ঢাকা দেওয়া হইত। ঔষধে যে রোগীর জ্বর ছাড়ে না, তাহার এইরূপ করিয়া জ্বর ছাড়াইতে দেখা গিয়াছে। বিশেষ বিষমজ্বরে স্নানাদির ব্যবস্থা কবিরাজ মহাশয়েরাও দিতেন।

মধ্যম রকমের একটী গামলা জলে পূর্ণ করিতে হইবে। ঐ জল যত শীতল করিতে পারা যায়, ততই ভাল। ঐ গামলাটির সঙ্গে সংলগ্ন করিয়া এক খানি জলচৌকী রাখিতে হইবে। চৌকীখানি গামলা অপেক্ষা উঁচুতে এক ইঞ্চ হইবে ও উহার কিনারা চারি আঙ্গুল আন্দাজ বাহির হইয়া থাকিবে। তাহা হইলে, জলচৌকীর কিনারা, গামলার কিনারা পার হইয়া জল পর্য্যন্ত আসিবে। তারপর, ঢিলে কাপড় পরিয়া কিম্বা বস্ত্রবিহীন হইয়া, উক্ত জলচৌকীতে বসিতে হইবে। দুই পায়ের নিচে, দুইখানি ইট, সুবিধার জন্য বাঁকাভাবে রাখিতে হইবে। বসিয়া একখানি রুমাল দক্ষিণ হাতে করিয়া, বামহস্তে পুরুষাঙ্গের উপরের চর্ম্ম, দুই নখের মধ্যে চাপিয়া ধরিতে হইবে। চর্ম্ম এমন ভাবে ধরিতে হইবে যে, লিঙ্গের অগ্রভাগ ও প্রস্রাবের দ্বার সম্পূর্ণ ঢাকিয়া যায়, তারপর, ধীরে ধীরে—গামলার জলে রুমাল ডুবাইয়া—উক্ত চর্ম্মের অগ্রভাগে ঘর্ষণ দিতে হইবে। একবার চামড়ার সহিত রুমাল সংলগ্ন করিয়া নীচে নামাইতে হইবে, পুনরায় জলপূর্ণ রুমাল উপরে তুলিতে হইবে। অনবরত এইরূপে ঘর্ষণ দিতে হইবে। এ ঘর্ষণ ২০ মিনিট হইতে আধ ঘণ্টা দেওয়ায় প্রয়োজন।

এ প্রয়োগে, ঐ চর্ম্মের অগ্রভাগ ও দুই হাতের কয়েকটী অঙ্গুলী ব্যতীত শরীরের আর কোন অংশ না ভিজে, তাহা

বিশেষ লক্ষ করিতে হইবে। কোন কোন রোগীকে ৮ম সংখ্যক প্রয়োগের বড় গামলার ভিতর বসাইয়া এ প্রয়োগ দেওয়ান হয়, সে ক্ষেত্রে তাহাদের পাছা ভিজে। কোন কোন ব্যাধিতে পাছা ভিজাইয়া স্নান দেওয়া হয়। জল কম দিয়া, গামলার ভিতর জলচৌকীতে বসাইয়া বড় গামলাতেও এ প্রয়োগ দেওয়া চলিতে পারে। কোন কোন ব্যক্তির উক্ত চর্ম্মের অভাব দেখা যায়, তাহাদের এ প্রয়োগের বিধি দেওয়া যায় না। স্ত্রীলোককে এ প্রয়োগ দেওয়ার বিশেষ বিধান আছে। তাঁহারাও স্ত্রীঅঙ্গের বহির্ভাগে জল পূর্ণ রুমাল দ্বারা ঘর্ষণ দিবেন। এ সকল প্রক্রিয়া সবিশেষ হৃদয়ঙ্গম করিয়া তবে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে, সকলকে বলি। ৯

পুনঃ পুনঃ ঘর্ষণ দেওয়াতে, কঠিন রোগীর ঘর্ষিত স্থানে নোনছাল যায়। কিন্তু তাহাতে ঘর্ষণে প্রতিনিবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। নরম রুমাল দিয়া, আরও ধীরে ঘর্ষণ দিতে হইবে। ঘর্ষণেই জল-শক্তি শরীরে চালিত হয়, ঘর্ষণই মুখ্য কথা। ঘর্ষণের ক্ষতকে সজীব রাখিবার জন্য, ক্ষত স্থানে জলপটি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। ঐ ক্ষত দিয়া শরীরের অনেক ক্লেদ বাহির হয়। ইহা দেখা গিয়াছে, সামান্য রোগীর বহুদিন ঘর্ষণ দিলেও ক্ষত হয় না।

শ্লেষ্মা ঘটিত ব্যাধিতে খুব ঠাণ্ডা জল মুখের ভিতর ৫। ৭ মিনিট রাখান হয়। উহাতে শ্লেষ্মার প্রকোপ কমিতে থাকে ও শ্লেষ্মা উঠে। ১০

শ্বাসরোধক ব্যাধিতে, ডিপথিরিয়াতেও, এ প্রয়োগ করান হয়। ৯ম সংখ্যক প্রয়োগের গুণ ডিপথিরিয়ায় অব্যর্থ। আধুনিক আবিষ্কৃত কোন ডাক্তারি ঔষধের, তাহা নাই।

কাটিয়া গেলে, কিম্বা ভাঙ্গিলে, কিম্বা পুড়িলে জলপটির ব্যবস্থা দেওয়া হয়। ক্ষত স্থানের গুরুত্ব অনুসারে পটির কাপড়ের ভাঁজ বাড়ান হয় এবং পটি পরিবর্ত্তনের বারের নির্দ্দেশ করা হয়। ১১

পূর্ব্বতন প্রাকৃতিক চিকিৎসার অধ্যাপকগণ অনেক ব্যাধিতে যেমন বাত—স্থানীয় জল-পটীর ব্যবস্থা করেন, কিন্তু এক্ষণে নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া উহা বর্জ্জন করা হইতেছে। ঘুম না আসিলে, কিম্বা অনিদ্রা রোগে, ২য় সংখ্যক মাটির কিম্বা ঐরূপ করিয়া জলের পটি তলপটে দিয়া শুইলে ঘুম হইতে পারে। কিন্তু জলের পটিতে মধ্যে মধ্যে জল দিয়া বেশ জল-ভরা রাখিতে হয়। এরূপ পটিতে আভ্যন্তরীন্ উত্তাপ বাহিরে আনে, অর্থাৎ পটি গরম হয়। প্রসূতিকে এই উভয় পটি দেওয়ার পর, পশমের টুকরা দিয়া জড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে। এ সকল প্রয়োগের পর, প্রস্রাবের রং লাল ও ঘন হয় এবং শরীরও কিছু দুর্ব্বল হয়। এ সকল ভাল লক্ষণ অর্থাৎ ব্যাধি কমিবার পথে চলিয়াছে, জানিতে হইবে।

জল প্রয়োগের ইহাই শেষ কথা যে, ঘর্ষণযুক্ত প্রয়োগ গুলিই প্রধান। যতই ঘর্ষণ হইবে, ততই শরীর ঠাণ্ডা হইবে, ইহা যেন কেহ না ভাবেন, কারণ ঘর্ষণেই উত্তাপের অন্যতম কারণ। ঘর্ষণ জল-প্রয়োগ Sedative অবসাদক নহে, উত্তেজক, Stemulant, বড়ই স্ফূর্ত্তির জিনিষ। একটা ঘর্ষণ প্রয়োগের পর, শক্তি কোথা হইতে চলিয়া আসে। আগে যে মানুষ কেঁচোর মত গড়াগড়ি যাইতেছিল, প্রয়োগের পর সে সর্পের মত ছুটিবে। এক কথায়, জল-ঘর্ষণে জীবনীশক্তির বৃদ্ধি করে। ৮ম ও ৯ম প্রয়োগ রোগীকে দৈনিক ৩।৪ বার দেওয়ার দরকার।

বাষ্প।

বাষ্প প্রয়োগের উদ্দেশ্য শরীর ঘামান। তাহাতে শরীরের ক্লেদ ঘাম হইয়া বাহির হইতে সুন্দর অবকাশ পায়। শরীর ঘামিলে ব্যায়ামের কার্য্য করে। শরীর প্রচুর রকমে এবং সাধারণ রকমে ঘামান যাইতে পারে। প্রচুর রকমে ঘামাইতে হইলে ৩।৪টী পাত্রের দরকার হয় এবং শুইবার উপযুক্ত ফ্রেমের দরকার হয়। রোগীকে সপ্তাহে একবার কি দুইবার প্রচুর প্রয়োগ দেওয়া উচিত। কিন্তু কঠিন রোগীকে প্রথমতঃ এ প্রয়োগ না দিয়া সাধারণ প্রয়োগ দেওয়াই ভাল।

আর সাধারণ রকমে প্রয়োগ লইতে হইলে ২।১টী পাত্র ও জলচৌকী কি বেতে-ছাওয়া চেয়ারের দরকার। এ প্রয়োগ নিত্য লইতে পারেন। বালকদিগেরও এ প্রয়োগের ব্যবস্থা আছে। প্রথমতঃ ঐ পাত্র কিম্বা মাটির হাঁড়ি অর্দ্ধেক জলে পূর্ণ করিয়া সরা দিয়া ঢাকিয়া অগ্নির উপর দিতে হইবে, জল ফুটিলে যে বাষ্প হইবে, তাহারই ব্যবহার করিতে হইবে।

বেঞ্চের মত উচ্চ করিয়া এবং ঐরূপ পায়া দিয়া একটী কাঠের ফ্রেম করিতে হইবে। উহার উপরিভাগ ১॥০।২ হাত চওড়া ও ৪ হাত দীর্ঘ হইবে। কিন্তু উহার উপর তক্তা থাকিবে না, হয়, ফাঁক ফাঁক করিয়া কাঠের গজ দিতে হইবে, নয়, দড়িতে কি বেতে ছাইয়া দিতে হইবে। এই ফ্রেমের নিম্নদেশে এককালীন ৩টি হাঁড়ি বেঁড়ের (হোগলের [illegible] অথবা) উপর ১।০ হাত অন্তর সাজাইয়া দিবে ও ঢাকনি খুলিয়া দিবে। তারপর ঐ ফ্রেমের উপর চিত, উপুড়, কাত হইয়া শুইয়া শরীর প্রচুর পরিমাণে ঘামাইবে। ২০ মিনিট কি আধ ঘণ্টা ফ্রেমের উপর থাকা যাইতে

পারে। শুইবার সময় শরীর ও ফ্রেম কম্বলে কিম্বা মোটা কাপড়ে এমন করিয়া ঢাকিবে যে বাষ্প না বাহির হইতে পারে। বাষ্পের উত্তাপ বোধ হইলে, মধ্যে মধ্যে মধ্যেকার বাষ্প কাপড় তুলিয়া বাহির করিয়া দিবে। কাপড়ের মধ্যে নিতান্ত ফাঁপর বোধ হইলে, মুখ কাপড়ের বাহির করিয়া দিবে।

বাষ্প কম হইলে, ৪র্থ পাত্র যাহা উনুনে আছে, তাহা একটির স্থানে দিয়া, সেটিকে আবার উনুনে গরম করিতে দিবে; এইরূপে মধ্যে মধ্যে পাত্র বদলান দরকার। এ প্রয়োগের ঠিক পরেই সর্ব্ব শরীর ঠাণ্ডা জল দিয়া বিশেষরূপে ধুইয়া দেওয়া উচিত। তারপর শরীর মুছিয়া ৮ম সংখ্যক কিম্বা ৯ সংখ্যক প্রক্রিয়া করিতে হইবে। বাষ্পে শরীরের মলকে গলাইয়া শরীরের ভিতর রাখে, উক্ত দুই প্রক্রিয়া বলে ঐ সকল মল শরীরের বাহিরে আসে। ১২

পাশ্চাত্য অধ্যাপকগণ, সুবিধার জন্য বাষ্প প্রয়োগের অনেক রকম যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন, উহা আমাদিগের পক্ষে ব্যয়সাধ্য। এসিয়া মাইনর প্রদেশে, ছোট বড় লোক ও স্ত্রীলোক বালকে, এরূপ প্রক্রিয়া প্রতি সপ্তাহে ২।১ বার করিয়া থাকে, তথায় বাষ্প স্নানে ব্যয়ও সুলভ। কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে স্নানাগার থাকে, তথায় সকলে যায়। ঘরটী অগ্নির দ্বারা এমন গরম করিয়া রাখা হয় যে, ঘরে গেলেই শরীর ঘামিতে থাকে। তারপর গরম ও ঠাণ্ডা জলের বন্দোবস্ত আছে, উভয়ে মিলাইয়া শরীর ধুইয়া ফেলে। ইহা তাহাদের বড় আরামের ও আদরের জিনিস।

চেয়ারের নিচে একটা ও পায়ের নিচে একটা পাত্র রাখিয়া কাপড়ে শরীর, চেয়ার, পাত্র ঢাকিয়া সাধারণ প্রয়োগ লইতে হয়। পায়ের নিচে পাত্রটীর উপর সুবিধার জন্য ২ খান কাঠের গজ দেওয়া যাইতে পারে। আর আর সমস্ত প্রক্রিয়া ১২ শ সংখ্যক প্রয়োগের ন্যায়। তবে শরীর সম্পূর্ণ না ধুইয়া জলে ভিজা গামছায় মুছিয়া ঠাণ্ডা করা যাইতে পারে। ১৩

বাতের স্ফীত স্থানে, ব্যথার স্থানে, ক্ষত স্থান প্রভৃতিতে স্থানীক বাষ্প প্রয়োগের ব্যবস্থা আছে। একটী পাত্রের বাষ্পের ভিতর পীড়িত স্থান রাখিয়া পাত্রের সহিত কাপড় ঢাকিয়া, কিয়ৎক্ষণ বাষ্প লইয়া, ব্যাথিত স্থানকে ঘামাইবে, তারপর ঐ স্থান শীতল জলে বেশ করিয়া ধুইবে। ধোয়ার পর ৮ম, ৯ম সংখ্যক প্রক্রিয়া। ১৩ক

গলনালী প্রদাহ প্রভৃতি রোগে, ডাক্তারেরা জলের ভাপ্রা, নলীয় যন্ত্রের সাহায্যে ঐ সকল স্থানে দিয়া থাকেন। আমারা ঐরূপ করিবার প্রয়োজন বড় দেখি না।

ধূম।

জলযুক্ত ধূয়ে, শরীরের উপরিভাগের অর্থাৎ মাথা, কপাল প্রভৃতির শ্লেষ্মা, জল প্রভৃতি বাহির করে। ভিজা কাষ্ঠে আগুন দিয়া, কিম্বা অগ্নিতে কাঁচা ঘাস দিয়া, এরূপ ধূম উৎপন্ন হইতে পারে। ধুম ব্যবহার করিতে হইলে, ঐরূপ ধূম পূর্ণ ঘরে যাইলে, কিম্বা কাপড়ের ভিতর ধুম সহিত অগ্নি বেষ্টন করিয়া, মুখে লাগাইলে, চক্ষু ও নাসিকা দিয়া ক্লেদ নির্গত হয়। তারপর ঠাণ্ডা জলে ধুইতে হইবে, ইত্যাদি। ১৪

কবিরাজেরা ধূমের ব্যবস্থা পূর্ব্বে দিতেন জানিতাম। একজন প্রথিত-নামা কবিরাজ, মৃতবৎসা রোগে, সূতিকাগারে নানাপ্রকার দ্রব্যের ধূমের ব্যবস্থা করায়, সে যাত্রায় সন্তানটি রক্ষা পাইয়াছিল।

রৌদ্র।

গরমের দিনে, দ্বিপ্রহরে রৌদ্রে, বস্ত্রবিহীন হইয়া কিম্বা সামান্য কাপড় পরিয়া, শরীর কম্বলে কিম্বা কচি পাতা (কদলী প্রভৃতির) দিয়া সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া আধ ঘণ্টা, ৩ কোয়াটার পরিয়া থাকিতে হইবে। পূর্ব্বে দেখিতে হইবে যে, সে সময় মেঘ ও বাতাস না থাকে কিম্বা সামান্য থাকিতে পারে। রৌদ্রে চারি পাশ ফিরিয়া বেশ করিয়া শরীর ঘামাইতে হইবে। মাথায় ও তলপেটে ২ খানি ভিজা গামছা সূর্য্যের তেজ নিবারণের জন্য জড়াইতে হইবে। মাদুর পাতিয়া শুইবে, একটি ছোট বালিস সুবিধার জন্য দেওয়া যাইতে পারে। পাতায় শরীর ঢাকিলে, পাশ ফিরিবার সময় পাতা সরিয়া যাইবে, তজ্জন্য একজনের পাতা পুনঃ সংস্থাপনের জন্য থাকার দরকার। শরীর ঘামানর পর ১২শ সংখ্যক প্রয়োগের ন্যায় শরীর সম্পূর্ণ ধোয়া ও ৮ম কিম্বা ৯ম প্রয়োগ দেওয়ার দরকার। কম্বল কি পাতার পরিবর্ত্তে ভিজা কাপড়ে শরীর ঢাকিয়া, এ প্রয়োগ করা যাইতেও পারে। ১৫

এ প্রয়োগের বর্ণনা শুনিয়া, মনে ধনুষ্টঙ্কারের বিভীষিকা আসে। কিন্তু কার্য্যতঃ, সূর্য্যের তেজ লওয়ার পর, শরীর ঘামিলে, আরামে ঘুম পায়, এ প্রক্রিয়াই ব্যাধি বিতাড়িত করিবার অমোঘ অস্ত্র। সূর্য্যদেবের শুভ দৃষ্টি হইলে, ব্যাধির ঘোরা রজনী অন্তর্ধান করে। সূর্য্যের

তেজেরও স্থানীয় প্রয়োগে আছে। কিন্তু তাহাতে বিশেষ সুবিধা না থাকিবাতে লিখিত হইল না।

প্রত্যক্ষ উত্তাপ অর্থাৎ কড়া আগুন কি সূর্য্যের প্রখর তেজ লাগান, শরীরের পক্ষে, কোন অবস্থাতেই ভাল নহে। উহাতে ব্যাধি পদার্থকে কঠিন করে। পুলটিস্ ও ফোমেন্‌টেসনে আগুনের তেজ জলীয় দ্রব্যের ভিতর দিয়া আসে। তজ্জন্য উহাদিগকে কতকাংশে অনুমোদন করিতে হয়। বহ্নি সেবন স্থান বিশেষে ব্যবস্থিত হয়।

বায়ু।

বায়ুই, একরূপ আয়ু। সকাল সন্ধ্যার বায়ু বড়ই উপভোগ্য জিনিষ। যত বড়ই রোগী হো'ক না কেন, রাত্রে দোর জানালা একেবারে বন্ধ করিয়া থাকিতে, পরামর্শ দেই না; এমন কি, শীতের জন্যও এই কথা।

যখন ঝিরিঝিরি সমীরণ বহে, তখন উহার প্রতিকূলে, ঐ বাতাসের গতি বুঝিয়া, সেইরূপ গতিতে, বক্ষঃস্থল সোজা করিয়া, মুক্ত স্থানে ভ্রমণ করা ফুস্‌ফুসের রোগীদের পক্ষে ভাল। এরূপ রোগীরা যেন গায়ে বেশ করিয়া কাপড় মুরিয়া বাহির হয়। ১৬

দুর্গন্ধময়, কিম্বা ঘরের ভার বাতাস, কিম্বা ধূনা কি কয়লার ধূমপূর্ণ বাতাস কাশীর রোগীর পক্ষে একবারেই ভাল নহে। এসেন্সের গন্ধও উহাদের পক্ষে অপকারী। যাহারা সামর্থের আকাঙ্খা করেন, ভীম হইতে চাহেন, তাহারা ঝড়ের সময় বায়ু সেবনে বাহির হইতে পারেন।

বায়ুবিত ব্যক্তি, প্রাকৃতিক চিকিৎসা মতে, চিকিৎসিত হইতে ইচ্ছা করিলে, তাহাকে সকল কাজ ত্যাগ করিয়া, প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপকের

ব্যবস্থানুসারে দিনযাপন করিতে হইবে। তবে সামান্য ব্যাধিতে নিজের কার্য্য চালাইয়া, প্রাকৃতিক বিধি পালন করিতে পারা যায়।

পরিশিষ্ট (খ।)

খাদ্যাখাদ্য।

ব্যাধিগ্রস্তের একরূপ খাদ্য, সাধারণের অন্যরূপ। ব্যাধিত ব্যক্তি দ্রব্যের যথাসম্ভব, স্বাভাবিক অবস্থায় খাইবে, ধীরে ধীরে ও অল্প পরিমাণে খাইবে। যে খাদ্য আমরা খাইয়া থাকি, উহার পরিবর্ত্তন না করিয়া, শুধু খাদ্যের দ্বারায়ই সকল ব্যাধি আরোগ্য করিতে পারা যায়। সে ক্ষেত্রে প্রয়োগেরও দরকার হয় না। কিন্তু খাদ্য চিকিৎসা বড়ই কঠিন। তজ্জন্য লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইলাম না এবং উক্ত বিষয়ে লেখকের অধ্যবসায়ও অসম্পূর্ণ। জিহ্বা বড়ই প্রবল অশ্ব, ইহার বন্ধন ঠিক রাখিতে পারে, এমন ব্যক্তি কম। জীবনের একটা সময় আসে, তখন মনটা শুধু, ইহা খাই, উহা খাই, করে। ছিন্নমস্তার মত, গলা

কাহিয়া, নিজের রক্ত পান করার, এই সময়। ইহা স্বাভাবিক ক্ষুধা নহে, ইহা ব্যাধির ক্ষুধা। মরীচিকার মত, একটা ক্ষুধার ভাব, আমাদের মনকে ভ্রান্ত করে। ঐ ক্ষুধা, খাইবার জন্য, আমাদিগকে ত্বরিত তাড়না করে, কিন্তু মন সন্তোষ করিয়া খাইতে পারি না ও এরূপ খাওয়ার পর ব্যাধি দেখা দেয়। মোটামুটি সাধারণ খাদ্যাখাদ্য এক্ষণে লেখা হইতেছে, পরে ব্যাধিতের খাদ্যাখাদ্য লেখা যাইবে।

সাধারণ।

সকালে চা পান করা অভ্যাস থাকিলে, তাহা ছাড়িতে হইবে। প্রকৃতি সকাল ও বিকালকে স্নিগ্ধ করিয়াছেন, তবে চা খাইয়া ঐ সময় দুইটিকে গরম করা কেন? চা একটা নেশা বিশেষ, সময় বহিয়া গেলে, কিম্বা না খাইলে, কেমন কেমন ঠেকে; গরম কম হইলে, চা বেশী, কি কম হইলে, কেমন বোধ হয়, এইরূপ হওয়া নেশার ধর্ম্ম। Tetoteller (এক কালীন নেশাবর্জ্জনবাদী) মহোদয়দিগের মনোযোগ এ বিষয়ে ন্যস্ত করিতে অনুরোধ করি। রোগীর হাত ও পা ঠাণ্ডার সময় অত ঠাণ্ডা বোধ হয়, তাহার কারণ, শরীরের সমস্ত গরম আসিয়া পেটে জড় হয়, ঐ পেটের গরম যাহাতে সমস্ত শরীরে ছড়াইতে, হাত পা গরম হইতে পারে, তাহাই করুন। গরম পেটে আবার গরম চা দেওয়া কেন? চাকে অনেকে পাঁচন ভাবিয়া 'ঔষধার্থে' পান করিয়া থাকেন, পাঁচন পাকের একটা নিয়ম (recipe) আছে, কিন্তু যে নিয়মে চা তৈয়ার করা হয়, তাহার সহিত পাঁচন পাকের নিয়মের অনেক ব্যতিক্রম দেখা যায়। আহার প্রবেশের দ্বারে (মুখে), প্রকৃতি কেবলি প্রহরী (দাঁতের সারি) সাজাইয়া রাখিয়াছেন, ইহা দেখিয়া

বেশ অনুমান করা যায় যে, ঐ পথে আহারীয় যাহা যাইবে, তাহা দন্তের বিষয়ীভূত হওয়া বাই, অর্থাৎ যাহা চর্ব্বণ করিয়া খাওয়া যায়, এমন হইবে। আপনারা সদাই দন্তকে মোসহারা দিবার জন্য ব্যাকুল হন, কেবলি তরল, জলীয় খাদ্য খাইয়া থাকেন, সেই জন্য অকালে দন্তগণ কালগ্রাসে পতিত হয়। চর্ব্বন করিয়া খাওয়া যায়, এমন খাইলে, দাঁত অনেক দিন স্থায়ী হয়। আমাদিগের দাঁত, এমন নাজুক যে একটী অম্ল ফল খাইলেই দাঁত স্থবির হয়। আর চিবাইতে পারেনা। তরল খাদ্যে দন্তের যেমন দরকার নাই, শরীরেরও তেমনি দরকার কম, চা পান কেন, সমস্ত পানকেই এ হিসাবে আমরা কমাইতে বলি, তৃষ্ণার সময়, রৌদ্র বাতাস লাগে, এমন জল (নদী, পুকুর কি কূপের) পান করিয়া পিপাসার শান্তি করিবেন।

সকালের জল খাইবার সময় (Break-fast), সময়ের সদ্যঃফল, মুগ কিম্বা বুট ভিজা, দেশী চিনি কিম্বা গুড় দিয়া খাইবেন। 'সময়ের সদ্যঃ' কথা দুইটা একটু বুঝুন। সময়ের, অর্থাৎ বৈশাখ মাসে তরমুজ খরমুজ, জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে আম কাঁঠাল ইত্যাদি, সদ্যঃ অর্থাৎ খাইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে গাছ হইতে পাড়া, ঘরে রাখা কিম্বা বিদেশ হইতে আমদানি করা নহে। ফলে স্থায়ী শারীরিক ও মানসিক বল হয়। আপনারা যদি ফল আহার করেন, তবে দেখিবেন প্রকৃতি আপনাদের জন্য ৩৬৫ দিনে কত প্রকার অমৃত ফল প্রসব করিয়া আপনাদের পরিতোষ সাধন করিতেছেন। আমাদিগের ফলাহারী পূর্ব্ব পুরুষগণ কত দীর্ঘায়ুঃ ছিলেন এবং আধ্যাত্মিক ও মানসিক জগতের উন্নততম

...জন আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। তবে দুর্ব্বল হইবেন, ...-পতি কাজ-কর্ম হইবে না বলিয়া এত ভয় পান কেন? কাল্পনিক (Theoretical) জগত ছাড়িয়া বাস্তব (Practical) জগতে আসুন, দেখা যাউক, কিসে কি হয়, আর কিসে কি না হয়। সহরবাসীদিগের সদ্য ফলপাওয়ার সুযোগ কম, অগত্যা তাঁহাদিগকে বিদেশ ও পল্লী হইতে আমদানী ফলে জলযোগ সম্পাদন করিতে হইবে। দেশজ ফল না পাইলে, কিম্বা পথে ... শুখ্‌না (strewed) ফল খাওয়া যাইতে পারে। পূর্ব্বে 'দেশী ...' বলিয়া একটা শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে, উহাতে লেখকের মনের কোনরূপ বিরোধ ভাব নাই। দেশী চিনি আক হইতে তৈয়ার হয়, আক, স্বভাবত খাদ্য বস্তু, আর বিট প্রভৃতি হইতে বিলাতি চিনি হয়, বিট খাদ্যের অনুপযোগী। যাহা স্বাভাবিক (প্রাথমিক) অবস্থায় খাওয়া যায়, তাহার বিকৃতি খাওয়া যাইতে পারে, ইহাই নিয়ম। বিটে যেমন চিনিভাগ পাওয়া যায়, অমন চিনিভাগ অনেক অস্পৃশ্য বস্তুতে আছে। আপনি কি তাহা খাইতে পারেন? না, কিন্তু, দেখিবেন, পিপীলিকারা উহা মহানন্দে গ্রহণ করিতেছে। আর আমদানী জিনিস সদ্য হয় না, যে জিনিস যত সময় বাহিরে পাওয়া যায়, সে জিনিস তত গুরুপাক হয়, অর্থাৎ পেট গরম করে।

আপনারা যে জলযোগের কার্য্যটি সর্ব্বতোভাবে 'ময়রার' উপর বরাত দিয়া রাখিয়াছেন, উহা ভাল নহে। নিজের ক্ষুধা পাইলে, কিম্বা কুটুম আসিলে, পয়সা লইয়া দৌড়ান, উহা কি ভাল? খাবার কিনেন, না ব্যাধি কিনেন? বাজারের বার আনা

খাবার আপনাদের দৈনন্দিন আয়ু খাবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। গোয়ালার জিনিস ও কাঁচা সন্দেশ অনেকাংশে ভাল হইতে পারে, কিন্তু পক্কান্ন খাইবার সময় বিশেষ সাবধান হইবেন। পূর্ব্বে চিনি সম্বন্ধে কিছু লিখিয়াছি, এক্ষণকার মত উহাই যথেষ্ট। ময়দা ও ঘৃত ও নিওার সম্বন্ধে আর কয়েকটী কথা লিখিতেছি। চিনি সম্বন্ধে যে কথা ময়দার সম্বন্ধেও সেই কথা। ময়রারা যে ময়দা সাধারণতঃ ব্যবহার করে, উহা কলের, কলে অনেক স্থানে গম ব্যতিত অন্য অখাদ্য বীজ ভেজাল করিয়া ময়দা প্রস্তুত করা হয়। আর কলে ময়দা ঠিক জাঁতার ন্যায় পিসিয়া গুঁড়া করা হয় না, অন্য রকমে গুঁড়া করা হয়, বিলাতের পণ্ডিতেরাও কলে প্রস্তুত ময়দার পক্ষপাতী নহেন, তাঁহারাও জাঁতার পেশা ময়দার উপকারিতা উপলব্ধি করিয়াছেন। ঘৃত দেব-ভোগ্য জিনিষ, কিন্তু সময়ে সময়ে পথ চলিতে ময়রার দোকানে যে ঘৃতের গন্ধ পাওয়া যায়, সেরূপ গন্ধ নিমতলা ঘাট দিয়া যাইতে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। বাজারের অবস্থা এমন যে; যে সকল ঘৃত সাধারণতঃ বিক্রীত হয়, তাহাতে হয় বাদাম কি মৌয়া ইত্যাদির তেল ভেজান আছে, নয়ত চর্ব্বি আছে। ঘ্রাণে, আস্বাদনে ভাল গো মহিষের ঘৃত কয়টি দোকানে পাওয়া যায়? আর যাহা পাওয়া যায়, তাহাতে গৃহস্থের ঘর চলিতে পারে, কিন্তু দোকান চলিতে পারে না। খাঁটি জিনিষ যদি কোন দোকানদার রাখিল, তখন আপনারা দারিদ্র হইলেন, অত চড়া দর দিতে পারিলেন না। কেন, রোজ খাবার খান, এক দিন বাদ এক দিন খান না? খাবার না খাইলে মানুষ মরে না। নিওার বলিয়া পূর্ব্বে একটী

শব্দ লিখিয়াছি, উহা আপনাদের কাণে নূতন নূতন ঠেকিতে পারে, কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলীতে ঐ শব্দের ভূয়ঃ ব্যবহার পাইবেন। নিঙার অর্থাৎ শেষ, আজ এক মণ ঘৃত পোড়াইয়া এক সের থাকিল, আবার কাল ঐ সেরে আর এক মন দিয়া কাজ করার পর, মনে করুন, দুই সের থাকিল, আবার ঐ দুই সেরে ঘৃত যোগ হইয়া খরচ হওয়ার পর, খানিক ঘৃত অবশিষ্ট অর্থাৎ নিঙার থাকিল। এইরূপে নিত্য নূতন ঘৃত নিঙারের সহিত যোগ হইয়া রামনবমীর নিঙার দুর্গোৎসবের মহানবমীতে আসিয়া ঠেকে। হোমিওপ্যাথিক মতে কহিতে গেলে, কহিতে হয়, আসল জিনিষের (mother tincture) ২০০ শত ডাইলিউসন হইয়াছে। হোমিওপ্যাথি বীজ (নিঙার) শক্তির গুণ জানেন শুধু, কিন্তু আমরা ঐ বীজ শক্তির দোষেও সম্পূর্ণ অবগত আছি। বিজ্ঞান জানেন না বলিয়া, আপনারা নিঙারকে অবহেলা করিবেন না, নিঙার হইতে সাবধান হইবেন, আইন জানে না বলিয়া দোষী কবে শাস্তি হইতে অব্যাহতি পায়? আপনাদের ঘরে এক দিনের খাবার দ্বিতীয় দিন বাসী হয়, অর্থাৎ না খাইবার মত হয়, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ময়রারা তাহাদের দোকানের খাবার বাসী বলিয়া ফেলিয়া কিম্বা আলাদা রাখিয়া দেয় কি? কখন কোন দোকানে নিঙার দোষে দুষ্ট কড়া মাজিতে দেখিয়াছেন কি? গৃহস্থের ঘরে, হাড়ি কড়া প্রভৃতি নিত্য মাজা কিম্বা বদ্‌লান চলিতে পারে না, সেই জন্য হেঁসেলের সৃষ্টি। যেমন দেবতাকে হেঁসেলের জিনিষ দেওয়া হয়না, ঐরূপ রোগীকে হেঁসেলের তৈয়ার খাদ্য দেওয়া উচিত নহে। নিঙার দোষ ঘৃতে যেমন হয়, সেইরূপ সের। প্রভৃতিতেও হইয়া থাকে। আপনারা চা খাবার সময়

ইংরাজের অনুকরণ করেন, কিন্তু খাবার খাইবার বিষয়ে করেন না, এইটি বড়ই দুঃখের কথা।

চা'ল দা'ল, শাক তরকারী, মাছ দুধ এই সকল দেশের প্রধান খাদ্য, ধনী গরিবের ইহাই প্রধান আহার, ইহার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। ধান হইতে চাউলকে বিভিন্ন করিলে, উহার জননী শক্তি অর্থাৎ পুনরায় ধান গাছ সৃজনের ক্ষমতা নষ্ট হইয়া যায়; দালেরও খোসা ছাড়াইলে ঐরূপ জননী শক্তি নষ্ট হয়, কিন্তু তাই বলিয়া চাউল কি দাইলের প্রাণ এককালীন বিনষ্ট হয় না। ঐ সকল প্রাণময় খাদ্যের আহারে, আমরা নিত্য নূতন প্রাণে উজ্জীবীত হই। একটা চাউলের আজ যেটুকু প্রাণ (শক্তি) আছে, কাল উহা হইতে কমিয়া যাইবে, পরশ্ব আরও কমিবে ইত্যাদি। বৃদ্ধের জীবনী-শক্তি যেমন নিত্য কমিয়া যায় ও জগতের জন্য ক্রমশঃ অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। এইরূপ সমস্ত আহারীয় সামগ্রীই, শুধু চাউল কেন, প্রকৃত আহারের সময়ের পরে ক্রমশঃ অয়োজনীয় অর্থাৎ গুরুপাক হয়। অগ্নি দ্বারা যেমন পাক হয়, কালের দ্বারাও ঐরূপ পাক হইয়া থাকে, কালও প্রত্যেক বস্তুকে লইয়া প্রতিক্ষণে ক্রিয়া করিতেছেন, নূতনকে পুরাতন করিতেছেন, কাল চুলকে পাকাইতেছেন। আজ নবান্নের চাউলে অগ্রহায়ণ মাসে যে টুকু প্রাণ পাইবেন, আগামী বর্ষে কার্ত্তিক মাসে জানিবেন, সে প্রাণটুকু কমিয়া গিয়াছে, চাউল বৃদ্ধ, কিঞ্চিৎ গুরুপাক হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে আমরা এখনকার চাউলকে লঘুপাক ও এক বৎসর পরের

চাউলকে গুরুপাক বলিতেছি। এখনকার চাউলকে শরীরের পক্ষে উপকারী ও লঘুপাক এবং এক বৎসর পরের পরের চাউলকে শরীরের পক্ষে কম উপকারী ও গুরুপাক বলিতেছি। নূতন চাউল পরিমাণে কম খাইতে হইবে। কিন্তু জগতে আপনারা ইহার বিপরীত শুনিতে পাইয়া থাকেন। কবিরাজ মহাশয়েরা এবং ডাক্তার বাবুরা কত বৎসরের কীটোচ্ছিষ্ট চাউল রোগীর জন্য ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। আমাদের মনে হয়, খাদ্য যখনই মানুষের খাইবার অযোগ্য হয়, অমনি প্রকৃতি উহা কীট দ্বারা খাওয়াইতে আরম্ভ করেন। নূতন চাউলে প্রাণ বেশী, তজ্জন্য উহার ক্রিয়া-শক্তি বেশী, পুরাতন চাউলের প্রাণ কম, তজ্জন্য ক্ষমতাবিহীন। নূতন চাউল পেটে গিয়া শরীরের আবদ্ধ মলকে বাহির করিয়া দেয়, কিম্বা দিবার চেষ্টা করে। পুরাতন চাউলের সে ক্ষমতা কোথায়? উহা মলকে ঘাঁটায় না, উপরন্তু নিজে মল হইয়া শরীরে বসিয়া থাকে। এই মলকে বাহির করিয়া দিবার জন্য ডাক্তারের জোলাপের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, তবে দাস্ত হওয়ায় ভয় পান কেন!— যদিও 'দেশে মল ভাণ্ডং ন চালয়েৎ' ব্যবস্থা চির-প্রচলিত। জোলাপের বাহ্য, উহা ভেল্কি বিশেষ, উহাতে শরীরের সকল প্রকার মল বাহির করিতে পারে না, জোলাপের পর হইতে আবার কোষ্ঠ বদ্ধ হইতে আরম্ভ হয়, তখন আবার জোলাপ চাই। চিরদিন যদি জোলাপ লইয়া বাহ্য করিলেন, সে ত জোলাপে বাহ্য করিল, আপনি কি করিলেন? আপনি নিজে স্বাভাবিক বাহ্য যাইবার চেষ্টা করুন। জোলাপের বাহ্যে সন্তুষ্ট হওয়া, আর পরের মল দেখিয়া সন্তুষ্ট হওয়া, প্রায়ই এক কথা।

জীব জগতে মনুষ্যের ইহাই প্রধান বিশেষত্ব, যে তাহারা পাক করিয়া খায়। পাক সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে। লঘুপাক খাদ্য খাইতে হইবে, গুরুপাক খাদ্য সাধ্যমত বাদ দিতে হইবে। লঘুপাক, অর্থাৎ অগ্নির জ্বাল কম সময় হইলে লঘুপাক হয়, আর বেশী সময় জ্বাল হইলে গুরুপাক। লঘুপাকে আগুনের আঁচ কম হইবে এবং জ্বাল ধীরে ধীরে হইবে, কাঠের জ্বাল লঘুপাক। কয়লার জ্বাল গুরুপাক, কারণ উহাতে আঁচ কড়া হয় এবং বড় তাড়াতাড়ি পাক হয়। প্রকৃতি কয়লাকে বাহ্য জগতের অন্তরালে রাখিয়াছিলেন, কিন্তু কৌশলী মানব ঐ মেদিনী গর্ভের ময়লাগুলাকে টানিয়া বাহির করিতেছে; উহার যেমন রং, আর পোড়াইলে তেমনি কু এবং তীক্ষ্ন গন্ধ ছাড়ে। (উষ্ণ) উষ্‌ণা চাউল লঘুপাক নহে, গুরুপাক; কারণ একবার ধান সিদ্ধ করিয়া উহাকে তৈয়ার করা হয়, দ্বিতীয়বার রাঁধিয়া খাওয়া হয়। নূতন পুরাতন লইয়া পূর্ব্বে যেমন আমাদের সহিত দেশ-প্রচলিত মতের বৈপরীত্য দেখাইয়াছি, বেশী ও কম জ্বালেও ঐরূপ মত বৈপরীত্য আছে। এক কথায় বলিয়া রাখি, যে, যতই পাক করা যাইবে, ততই জীবনী-শক্তি সেই জিনিষের হ্রাস হইবে। অসার কম জীবনীশক্তি বিশিষ্ট জিনিষ, যদিও বেশী মাত্রায় খাওয়া যায়, কিন্তু উহাতে শরীরের বিশেষ উপকার আসে না। পাকের সময়, ঘাঁটিলে পাক দ্রব্য গুরুপাক হয়। আঘাঁটা সকালের তরকারী বৈকালে চলে, কিন্তু ঘাঁটা তরকারী বৈকালে গন্ধ ও অম্ল হইয়া যায়। যাহা হউক, স্থির মনে আহার করিবেন, কোন চিন্তা কি গল্প ঐ সময়ে করিবেন না। আপনার মুখ দিয়া ভগবান্ খাইতেছেন, এইটী যেন মনে রাখিবেন, আর ভগবানকে

খাওয়াইতে পারেন, এইরূপ জিনিষ খাইবেন। খাইবার সময় খাদ্য বস্তুকে ধীরে ধীরে ও সম্পূর্ণরূপে চর্ব্বণ করিয়া গলাধঃকরণ করিবেন। আধিক্য দোষ মনোযোগ পূর্ব্বক বর্জ্জন করিবেন। আধিক্য দোষ বলিতে বেশী লবণ, কি ঝাল, কি মিষ্ট, কি তিক্ত ইত্যাদি কিম্বা পরিমাণে বেশী বুঝিতে হইবে। মঙ্গলামঙ্গল জিজ্ঞাসা করায়, এক ব্যক্তি উত্তর দিয়াছিলেন, হোটেলে আহার ধরা অবধি আছি ভাল। সে কি? কারণ হোটেল ওয়ালারা তেল, মস্লা, খাদ্যের পরিমাণ সবই কিছু কম করে। ইহাতেই ব্যাপার বুঝুন। ক্ষুধা পাইলে খাইবেন, খাবার প্রস্তুত হইলেই যে খাইতে হইবে, ইহা কোন কথা নহে। কম খাইবেন, কিন্তু লোভে কি অনুরোধে বেশী খাইবেন না। পরিমাণমত খাওয়া হইলেই, প্রণিধান করিয়া দেখিবেন, কে যেন ভিতর হইতে বলে, 'হইয়াছে, আর না।' আমাদের মতে, যেরূপ পাক-প্রণালী আদর্শ হওয়া উচিত, তাহাই নিম্নে লেখা যাইতেছে। কার্য্যতঃ পরীক্ষা করিলে, ইহার গুণ জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

অন্ন প্রস্তুত।

* হাঁড়ীতে এমনভাবে চাউল ও জল দিবেন যে, ঐ জলে চাউল ৸৶৹ আনা সিদ্ধ হয়। ৵৹ আনা শক্ত থাকিতে হাঁড়ী উনুন হইতে নামাইয়া, সরা দিয়া ঢাঁকিয়া দিবেন। কিছু সময়ের পর, দেখিবেন, চাউল ভাঁপে সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইয়াছে। ফেন গালিবার দরকার হইবেনা, ফেনের সহিত অন্নের সার-ভাগ চলিয়া যায়। ফেন গালা ভাত, বিনা তরকারীতে খাওয়া যায় না, কিন্তু ফেনযুক্ত অন্নে স্বাভাবিক মিষ্ট স্বাদ আছে। চাউল আতপের হওয়া দরকার এবং সকালে

চাউলে জল দিয়া ভিজাইয়া রাখিলে, চাউল কিছু আপনা হইতেই নরম হয়। আমাদের হেঁসেলের ভাত-তরকারীর হাঁড়ী মাস্তান জিনিষ। রোগীকে নিত্য নূতন হাঁড়ীতে রাঁধিয়া দেওয়া উচিত এবং সুস্থলোকের উচিত, বগুনাতে রাঁধিয়া খাওয়া ও নিত্য মাজান। অবশ্য এত গোলযোগ প্রায় লোকেরই ভাল লাগিবে না। খুব বেশী রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে, যদি তাহারা ভাত-ডাল-তরকারী খাইবার আবদার করে, তবে তাহাদিগকে খুব উত্তপ্ত জলের উপর হাঁড়ি ছাড়িয়া দিয়া, এ সকল পথ্য প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয়।

দাইল প্রস্তুত।

ভাজা মুগ ও কলাইয়ে দাল রাঁধা দেশের নিয়ম, কিন্তু আমাদের হিসাব অনুসারে, দেখিবেন, ইহা গুরুপাক; সব দাইলই আমরা কাঁচা খাইতে কহি। যে দাল যে দিন খাইবেন, তাহা সেই দিন সকালে কিম্বা পূর্ব্ব দিন রাত্রে, জলে ভিজাইয়া রাখিবেন, জলটুকু যেন ডালে শুষিয়া লয়, ফেলিতে না হয়। এরূপ করাতে ডাল নরম হয়, অল্প জালেই সিদ্ধ হয়। আমাদের গৃহিণীরা জল চরাইয়া দিয়া সংসারের অর্দ্ধেক কাজ সারেন, ইহাতে ডালে কেবলি জ্বাল পরিয়া গুরুপাক হয়। আর ডালে যেন জল কম করেন। অনেকে ডালের ঝোলেরই প্রিয়; কেহ ডাল চিপিয়া ফেলিয়া দিয়া, ঝোলটুকুই গ্রহণ করেন। এ সকল আমারা অনুমোদন করি না।

শাক-তরকারী।

সিদ্ধ মাখিয়া খাইতে আপনাদের নাসিকা তেলের গন্ধ পায়,— কারণ তখন কাঁচা তেল খান, ভাজা কি. লজ্জারের পর একত্র পাকে না।

[illegible] তেলই ভাল মনে; কারণ উহাতে সরিষা ছাড়া অন্য অখাদ্য বীজও মিশাল করা হয়, অখাদ্য বীজ হইতে যে তেল হয়, তাহা মোটা হয়, আর কলের তেলে লোহার পাত্রের একটা বদ রং ও দুর্গন্ধ হয়; ঘানি তৈল ভাতের সহিত খাওয়া যায়; তজ্জন্য বাজার দেখিয়া তেল কিনিবেন। আগে তেলে ভাজিয়া, পরে জলে সিদ্ধ করিয়া শাক-তরকারী রান্না হয়, কিন্তু আমরা উহার বিপরীত করিতে বলিতেছি। শাক-তরকারীর ভিতর জল-ভাগ আছে, তজ্জন্য শাক-তর-কারী নিজের জলেই নিজে কতকটা সিদ্ধ হইতে পারে, কেবল বাকি সিদ্ধ হওয়ার মত জল মিশাইবেন, জল তরকারী ঢাকিয়া দিবেন, তরকারীও সিদ্ধ হইবে, জলও শুখাইয়া আসিবে, ঝোল মাখামাখা হইবে। যখন শাক-তরকারী ৸৹ আনা সিদ্ধ হইবে, তখন মশ্‌লা, ফোড়ন, তেল, ঘি ইত্যাদি দিবেন। উহা করিলে ঐ সকল জিনিষের স্বাদ ভালরূপে পাওয়া যাইবে। মশ্‌লা জিনিষটা প্রায়শই গুরুপাক (Fermen-ted) কারণ উহাকে হয় জলে সিদ্ধ করিয়া, নয় রৌদ্রে শুখাইয়া রাখা হয়। এজন্য মশ্‌লা অল্প পরিমাণে ব্যবহার করিতে বলি। কাঁচা মস্‌লা [illegible] সুঘ্রাণ ও সুস্বাদু, কাঁচা ও শুখ্‌না মরিচের তুলনায় বিচার করিবেন। [illegible] মশলাই কাঁচা খাইবার নাই, কারণ দেশে জন্মে না।

ডাল, কড়াই, বড়া ইত্যাদিতে আগুনের অধিক তাপ লাগে, তজ্জন্য কম খাওয়া উচিত। বড়িও গুরুপাক। হিং, পিঁয়াজ প্রভৃতির ঘ্রাণ দুর্ঘ্রাণ আছে। অম্লকে অনেকে বিজ্ঞাপন [illegible] বলেন; কলির জীবন্ত দেবতা, কারণ [illegible] মুখে জল আসে। অম্ল সেবনে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইতে পারে; [illegible] কোষ্ঠবদ্ধ হইলে রোগীকে অম্ল-জলের ব্যবস্থা করা হয়। শীত

কারণই নানারূপ অম্ল ফল পাওয়া যায়। [illegible]বাসিগণ অম্লের মহাত্ম্য বিশেষ বুঝেন।

মাছ-দুধ।

ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা দেশেই, সম্ভবতঃ মাছের, বেশী আদর। মাছ না খাইলে অধিকাংশ বাঙ্গালীরই খাওয়া হয় না। ভারতবর্ষের পশ্চিম ও দক্ষিণ অংশের লোকেরা মাছকে বড়ই ঘৃণার চক্ষে দেখে। দক্ষিণাত্যে, মিউনিসিপালিটির বাজার ব্যতীত, অন্য কোন বাজারে মাছ প্রবেশ করিতে পায় না। এ সকল কারণে, মাছ, খাদ্য কি অখাদ্য তাহার বিচার দরকার। আমরা মোটা কথায় এই বুঝি, যাহা কাঁচা অবস্থায় খাওয়া যায়, তাহাই পাক করিয়া খাওয়া যাইতে পারে। এ অবস্থায় মাছ অখাদ্য, কারণ কাঁচা মাছের আঁষটে গন্ধে সকলেই বিরক্ত হন। কিন্তু বড়ই ক্ষোভের বিষয়, অনেকে মাথা স্নিগ্ধ রাখিবার জন্য মৎস্যের প্রাণ লইতে বলেন। মৎসভুক্ বাঙ্গালী ও নিরামিষভোজী হিন্দুস্থানীতে শারীরিক বলের অনেক তারতম্য। দেহের দৈর্ঘ্যে প্রস্থে বাঙ্গালী নিতান্ত কলির জীব! মাছের লালসা লোকের যেরূপ এবং বহু দিন হইতে মৎস্য ভক্ষণ প্রথা এদেশে প্রচলিত, সুদূর অতীতে প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক মার্কপলো যখন এদেশে আসিয়াছিলেন, তিনিও সেই সময়ে, মাছ, দুধ, ভাত বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য, এ কথার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এক্ষেত্রে আমি নিষেধ করিলে, খুব কম লোকেই সে নিষেধ শুনিবে। মৎস্য কম পরিমাণ এবং বারে কম খাওয়া যাইতে পারে। মৎস্যে ক্ষুধা নষ্ট করে ও শরীর ভার করে, ইহা পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে। শাস্ত্রকারেরাও মৎস্য-মাংস খাইতে কোন কোন সময়ে

ব্যরে নিষেধ করিয়াছেন এবং দেবতা ও পিতৃলোকের উদ্দেশ করিয়া খাইতে বলিয়াছেন। মাছের বিষয় মনু যাহা বলিয়াছেন, তাহাই সকলের নিকট মান্যার্হ হইতে পারে। "যে যে জীবের মাংস খায়, তাহাকে তাহার মাংস-ভোজী বলে, যেমন বিড়াল মুষিক মাংস-ভোজী। কিন্তু মৎস্য-ভোজীকে সর্ব্বমাংস-ভোজী বলে, এক মাছ খাইয়া সকল মাংস-ভোজী হওয়া বিষম পাপ, অতএব ইহা পরিত্যাগ করিবে।" তৎপরবর্ত্তী বিধানকর্ত্তাগণের ব্যবস্থা সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিলে, তাহাতেও বুঝা যাইবে, এ প্রকার দুবেলা সকল প্রকার মৎস্য ভক্ষণ তাঁহাদের অভিপ্রেত ছিল না।

পূর্ব্বে ছাগ মাংসই এ দেশে হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল, তাহাও দেবতাকে উদ্দেশ্য করিয়া ৯ মাসে ৬ মাস খাওয়া হইত। কিন্তু আজকাল মুসলমান ও ইংরেজদিগের সহবাসে আমরা রীতিমত মাংস-ভোজী জাতির মধ্যে পরিগণিত হইতে চলিয়াছি। সম্প্রতি যক্ষ্মা রোগের কারণ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য চিকিৎসা জগতে যে সকল আলোচনা হইতেছে, তাহারই ফলাফল লইয়া ছাগ-মাংশ, কুক্কুট-মাংস এবং গোমাংসের ইতর বিশেষ দেখান হইতেছে। ছাগের ও মেষের যক্ষ্মা খুব কম হয়। ইহার কারণ, ইহারা স্বচ্ছন্দ বনজাতভোজী। ইহাদের মাংস-ভোজী মনুষ্যেরও এই জন্য যক্ষ্মা রোগ কম হয়। কিন্তু কুক্কুট ও গো-জাতির মধ্যে যক্ষ্মা রোগ বেশী হয়, এজন্য মুরগ খাদক ও গোখাদকের অনেকের যক্ষ্মা হইতে দেখা যায়। সাধারণতঃ কুক্কুট যথেষ্ট কদাহার করিয়া থাকে, গরুর মালিকের দোষে গরুকে অনেক সময়ে মন্দ দ্রব্য আহার করিতে হয়। কুক্কুট ও গরুর মাংস এবং গরুর দুগ্ধ বিষাক্ত হওয়ার কারণই হইতেছে, উহাদের

অখাদ্য খাওয়া। খাশীকে অস্বাভাবিক প্রক্রিয়া করিয়া রাখা হয়, সেই জন্য উহার মাংস তত ভাল নহে। খাশীর তেল যাহাকে আমরা বলি, উহার বেশীর ভাগই ঐ জীবের ব্যাধি পদার্থ। মৎস্যেও অখাদ্য খাইয়া থাকে, শ্লেষ্মাদি জলে পড়িবামাত্রই মৎস্যেরা মহানন্দে উহা গ্রহণ করিয়া থাকে। এজন্য কোন মাছ অখাদ্য খায়, কোন মাছ খায় না, তাহা জানিয়া নির্দ্দোষ মৎস্য খাওয়া উচিত। হাঁসপাতালের অভিজ্ঞতা ফলে কলিকাতার কোন সরকারী ডাক্তারের অভিমত যে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানদের যক্ষ্মা রোগ অধিক হয়। ইহা জাতিগত কারণ নহে, পূর্ব্বোক্ত খাদ্যগত কারণ। ডাক্তারগণ রোগীকে বেশী কাতর দেখিলে, মাংস কিম্বা মাংসের যুশ ব্যবস্থা করেন, এ নিয়ম দেশ-প্রচলিত কবিরাজী ব্যবস্থার কতকটা বিরোধী। মাংস কিম্বা মাংসের যুশ যে ভাত দাইল অপেক্ষা গুরুপাক (over-nutritious), একথা, হয়ত অনেকেই স্বীকার করিবেন। যে রোগীর সহজ পরিপাকযোগ্য ভাত দালে অপকার করে, তাহাকে মাংসের ব্যবস্থা দেওয়া কেমন, তাহা বুঝি না। বলবান সার দিয়া এক বৎসরের জন্য জমি আবাদ করা, আর মাংস দিয়া রোগীর সাময়িক বল বৃদ্ধি করা, একই কথা। উভয় ক্ষেত্রেই ইহার ভাবীফল অশুভকর। নয়ত, এত অল্প আয়ু, এত রোগভোগী জীব জগতে জন্মিবে কেন? পাশ্চাত্য চিকিৎসা দর্শন স্পর্দ্ধা করেন, দিন দিন তাঁহারা উন্নতির উন্নত শিখরে উঠিতেছেন, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, রোগ, রোগী, ঔষধ, চিকিৎসক, ঔষধালয়, শুশ্রূষালয় এ সকল বৃদ্ধি হওয়া কি চিকিৎসার উন্নতি, না, এ সকলের অবনতিতেই চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি? ব্যারাম না হউক, ঔষধ না খাইতে হয়, চিকিৎসকের অধীনে কখনই না আসিতে

হয়, ইহাই সকলে চাহে। এই প্রসঙ্গে হাঁসপাতাল সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। হাঁসপাতাল যতই কেন মনোরম করিয়া করা হউক না কেন। হাঁসপাতালে প্রবেশ করিলে মনে কেমন ভয়ের সঞ্চার হয়, এমন কি, ঐ নাম পর্য্যন্তও আমাদের মনে ভীতি উৎপাদন করে।

সকালের দোহিত দুগ্ধ দিনের আহারের সময় খাওয়া দরকার এবং বিকালের দোয়া দুগ্ধ রাত্রের আহারের সময় খাওয়া উচিত। এ বেলার দুগ্ধ ও বেলায় খাওয়া ভাল নয়। সময় বহিয়া গেলে ও বদ্‌ হাওয়া লাগিলে দুগ্ধের সে স্বাদ, সে ঘ্রাণ থাকে না; উপরন্তু ব্যাধির সৃষ্টি হয়। গোয়ালের দুগ্ধ খাইতে নাই, গোয়ালারা দুগ্ধ হইতে মাখন তুলিয়া লয় ও জল মিশায়। মাখনযুক্ত দুগ্ধই খাদ্য, আর জল মিশাইলে দুগ্ধে বিষ ক্রিয়া করে। দুগ্ধে শতকরা ৪৭৷৷৹ ভাগ জল আছে, তাহার উপর আবার জল মিশান! আর্য্যেরা দুগ্ধে লবণ সংশ্রব করেন না, সম্ভবতঃ, দুগ্ধে লবণ-স্বাদ আছে বলিয়া। কলিকাতায় কোন কোন ছাত্রে ভাতে লবণ মাখিয়া, সেই ভাত দুগ্ধে মাখিয়া খান, দুগ্ধ নিস্বাদ হওয়ায় এবং তাঁহাদের আর্থিক অস্বচ্ছলতায়, তাঁহারা এমন করেন। অস্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় দুগ্ধ দোহা, দুগ্ধে অন্যান্য ভেজাল মিশান, এ সকল কথা লিখিতে গেলে অনেক লিখিতে হয়। এই সকল নিবারণের জন্য কলিকাতায় এতদিনে চেষ্টা হইতেছে, দেখিতেছি। এখন লোকের ঝোঁক সহরবাসী হওয়া। সহরে গো-পালন বড় কষ্টকর। সহরে রোদ-বাতাস রীতিমত মিলে না, ঘাসাদি স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যায় না, গোচারণের মাঠ নাই কিম্বা অনেক দূরে। পল্লীগ্রামে এ সকল অসুবিধা নাই। পল্লীগ্রামের গরু প্রায়শঃ সুস্থ, সহরের গরু সাধারণতঃ

ব্যাধিযুক্ত। ব্যাধিযুক্ত গরুর দুগ্ধ খাইতে নাই। উহাতে গরুর ব্যাধি আমাদের শরীরে প্রবেশ করে। গরু মোটা সোটা হইলেই নির্ব্ব্যাধি হয় না, সুস্থ গাভী দেখিলেই তাহা চেনা যাইবে, সুস্থ গাভী বেশ স্ফূর্ত্তি পূর্ণ; গরুর দুগ্ধ অন্যান্য খাদ্য অপেক্ষা শীঘ্রই দূষিত হয়, ইহা পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞান স্থির করিয়াছেন এবং গো-দুগ্ধে অনেক প্রকার সংক্রামক ব্যাধি চলাচল করে। এই হেতুতে, গরুটি সুস্থ কিনা, তাহা জানিয়া তবে সেই গরুর দুধ খাওয়া ভাল। ভাতের মাড় ইত্যাদি খাদ্য গরুকে খাওয়াইতে নাই। গো-পালন যে গৃহস্থের ধর্ম্ম, তাহা এখন আমরা ভুলিয়া যাইতে বসিয়াছি। আর আমাদের ছেলেরা পবিত্র গোবর ও চোনাকে এখন গরুর গু-মূত বলিয়া থাকেন; কিন্তু সেই দিন মনে করুন, যখন অধ্যাপকের গৃহে ছাত্রেরা গো-পালন ও গো-চারণ করিত! জননী স্বর্গের অপেক্ষা বড়, গরু আবার জননী অপেক্ষা বড়; কারণ মাতৃ-স্তন্য দুইদিন বেশী খাইলে দাঁতে পোকা ধরে, কিন্তু গোদুগ্ধ আজীবন খাওয়া যায়। আয়ুর্ব্বেদও গো দুগ্ধের একটি গুণ বলিয়াছেন, 'প্রাণধারকত্বম্।' লোকালয় ব্যতিত বনে গরুর যখন থাকিবার স্থান নাই। তখন গরুর হিতার্থে মানুষের প্রাণপণ চেষ্টা করা উচিত। ভাল দুধে চিনি দিয়া খাওয়া বেশীর ভাগ, ভাল দুগ্ধ স্বভাবতই মিষ্ট স্বাদযুক্ত। কাঁচা দুগ্ধ উপকারী, শরীরের ব্যাধি পদার্থ নির্গম করে, শরীর পাতলা করে। কিন্তু 'কাঁচা কাঁচা' গন্ধ করে বলিয়া দেশে চলন নাই। জ্বাল দেওয়া দুগ্ধেরই চলন আছে। সামান্য মত জ্বাল দিয়া দুগ্ধ খাওয়া উচিত, বেশী জ্বাল দেওয়া ঘন দুগ্ধ কিম্বা ক্ষীরাদি খাইয়া হজম করিতে পারে, বঙ্গদেশে এমন লোক একশে কম।

বেশীক্ষণ ধরিয়া দুগ্ধ জ্বাল দিলেই দুগ্ধের দোষ নষ্ট হয়, এটী আমাদের ভ্রম বিশ্বাস। ব্যারাম হইলে দুধ খাওয়া উচিত নয়। আগে জ্বরাদিতে কবিরাজ মহাশয়েরা দুধ খাইতে বলিতেন না। মহিষের দুগ্ধ এদেশে এখন চলিতেছে; যদিও গো-দুগ্ধের শ্রেষ্ঠত্ব অনেক বেশী, তবুও খাওয়া যাইতে পারে। গোয়ালাদের মহিষের দুধে জল মিশাইবার সুযোগ বেশী। দুধ বেশ ধীরে ধীরে পান করিতে হইবে। ভাত কি রুটি দিয়া দুধ খাওয়া যাইতে পারে। দেশে দুধের এমন দুর্ভিক্ষ হয় নাই, যে টিনের দুধ ব্যবহার করিতে হইবে। বলি, মধু থাকিতে গুড় কেন? টিনের দুগ্ধের বিষয়, শিশু চিকিৎসা প্রবন্ধে সবিশেষ লিখিত হইয়াছে।

কাঁচা দুগ্ধে কাঁচা ফল দিয়া মাটির কিম্বা পাথরের পাত্রে দধি জমাইয়া খাওয়াই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সচরাচর যেরূপ দধি পাওয়া যায়, তাহাও খাওয়া যাইতে পারে। এক্ষণে পাশ্চাত্য-জগত হইতে দধি সেবনের একটা বাতাস আসিয়াছে, উহারই বলে, অনেকে দধি সেবন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দধি স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তি বৃদ্ধি অর্থাৎ দীর্ঘায়ু করে, তদঞ্চলে সপ্রমাণিত হইয়াছে। ঘোলও ভাল জিনিষ। রোগীকে গরম দুধে অম্ল দিয়া ছানা করিয়া, সেই দুধ (ঘোলের মত) ছাকিয়া খাওয়ান হইতেছে। ইহা ডাক্তারদিগের ব্যবস্থা। ছানা-মাখন ভাল জিনিষ। মাখন, ঘৃতের পরিবর্ত্তে, তরকারিতে দিলে সুস্বাদ হয়। পূর্ব্বোক্ত জিনিষ সমস্ত ঘরে করিলেই ভাল হয়।

গব্য পদার্থ অতি সার যুক্ত জিনিষ, উহা যত কম মাত্রায় খাইতে পারা যায়, ভাল। অধিক খাইলে শরীর মোটা করে, শরীরের বলবৃদ্ধি না হইয়া শরীর মোটা হওয়ায় লাভ কি?

রাত্রের আহার।

আহারের একটা মাত্রা থাকা উচিত। মধ্যাহ্নের আহার যদি এক হয়, সকালের জলযোগ একের চার হইবে, বৈকালের জলযোগ একের চার এর কম হইলেই ভাল হয়, রাত্রের আহার ব্যাধিতের একের দুই, সুস্থের তিনের চার। এই পরিমাণ খাওয়াই আমাদের বিজ্ঞানসম্মত। এ কথাটা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে, পুনরপি বলা হইতেছে;—উদর পূর্ণ করিয়া খাওয়া দোষের; কিছু বাঁকি থাকিতে নিবৃত্ত হওয়া উচিত। চলিত কথায়ও বলে—

উন ভাতে দুনু বল, ভরা ভাতে রসাতল।

পূর্ব্ববঙ্গের লোকের পক্ষে রুটি চিবান কষ্টকর; পশ্চিম বঙ্গের লোকে পাতলা রুটি পাইলেই সুখী হন। কেহ কেহ মোটা রুটি ভালবাসেন। পশ্চিম দেশে মোটা রুটিরই চল্। ময়দা অপেক্ষা আটার রুটি, লুচি ভাল। মাখন কি গাওয়া ঘৃত রুটিতে মাখিলে রুটি মোলায়েম হয়। প্রাকৃতিক মতে, চোকল শুদ্ধ ময়দার রুটিরই সর্ব্বোচ্চ স্থান। চোকল বড় পুষ্টিকর খাদ্য; খাইতেও মিষ্ট, দাস্তও পরিষ্কার করে। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের এরূপ রুটি খাইতে বলি; এক মাসেই তাঁহারা ইহার সুফল উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ছাত্র জীবনে বেশী আরাম করা ভাল নহে, নিত্য লুচি, কচুরী খাওয়া তাঁহাদের পক্ষে 'বাবুগিরি'। এরূপ রুটি পরিমাণে, ক্রমশঃ বেশী খাইতে পারা যায়। চোকা শুদ্ধ ময়দা খাইতে বলিলাম, তাহাতে কেহ যেন রাগ না করেন, কারণ কথাটা শুনিতে কাঠা-কাঠা ঠেকে ও ঐরূপ ময়দা মাখিলেও সাধারণ ময়দার মত আঠা হয় না।

ঘৃতের যেরূপ দোষ পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে, তাহাতে বাজারের ঘৃত দিয়া প্রস্তুত করা মোহনভোগ নিত্য উপভোগ করা, কত দূর সঙ্গত, তাহা আপনাদের বিবেচনাসাপেক্ষ। সুজির পায়স বরং ভাল খাদ্য। ময়দা'র দ্বারাও আমরা একরূপ পায়স করিয়া থাকি, তাহাও নিম্নে লিখিত হইল। পূর্ব্বোক্তরূপ চোকল শুদ্ধ ময়দা একটা বাটিতে জলে গুলিয়া তরল করিতে হইবে, তারপর জল জ্বাল দিয়া ফুটাইয়া তাহার ভিতর ঐ তরল ময়দা দিয়া কেবলই নাড়িতে হইবে, কিছুক্ষণ পর চিনি মাখন কিম্বা কাঁচা দুগ্ধ দিয়া এ পায়স নামান হইবে। এ প্রক্রিয়ায় পায়স পাক দেশে রীতি নাই; কিন্তু লঘুপাক হয় বলিয়া লিখিলাম। এই প্রবন্ধ এইরূপে 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' করা গেল।

(এই সাধারণ খাদ্য প্রবন্ধটি বন্ধুবান্ধবের নিকট দুইবৎসর পূর্ব্বে পঠিত হইয়াছিল। ইহা সাধারণের উপকারে আসিতে পারে, এই বিশ্বাসে, সংশোধন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া দিলাম—লেখক।)

এই প্রবন্ধের প্রথমে লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে ব্যাধিতের খাদ্যাখাদ্য সাধারণ খাদ্যাখাদ্যের পর লিখিত হইবে। কিন্তু উহা মূল পুস্তকে লিখিত হওয়ায় আর লিখিবার প্রয়োজন বোধ করিলাম না।—লেখক।

Printed by Umeshnath Bhattacharjee at the Kanika Press, Murshidabad.
1910.